কেনেথ এন্ডারসন-এর

জঙ্গলে অমঙ্গল

রূপান্তরঃ ইশতিয়াক হাসান ফারুক

সবা প্রকাশনা

জঙ্গলে অমঙ্গল

কেনেথ এন্ডারসন/ইশতিয়াক হাসান ফারুক

প্রথম প্রকাশ: ২০০৭

অরণ্যের দিন রাত্রি

পূজারী মৃদু স্বরে ডাকছে, 'প্রভু, প্রভু, উঠুন! চারটে বেজে গেছে।' প্রথমে এন্ডারসনের, তারপর তাঁর তরুণ সঙ্গীর কানের সাথে মুখ ঠেকিয়ে ফিসফিস করে শব্দগুলো উচ্চারণ করল সে।

দ্রুত উঠে বসলেন তাঁরা। জঙ্গলে রাত কাটানো একজন মানুষের স্নায়ুকে সবসময়ই প্রস্তুত রাখতে হয়। মৃদু শব্দে দ্রুততার সাথে ঘুম থেকে জেগে ওঠার ক্ষমতা এখানে জীবন আর মৃত্যুর পার্থক্য এনে দেয়। প্রথমেই তাদের চোখ পড়ল আগুনটার দিকে, যেটার আলো তিন দিক থেকে ঘিরে থাকা বিশাল সব গাছের কেবল কাণ্ড ছুঁতে পেরেছে। অপর প্রান্তে তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন পানির একটা বিস্তৃত ধারা তারার আলোয় ঝিকমিক করছে। অন্ধকারকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এগিয়ে চলা কাবেরী নদীর পাগল করা ছন্দময় শব্দ কানে এসে বাজছে।

তাঁরা ক্যাম্প করেছেন নদীর তীরে, খোলা জায়গায়, চারদিকে ঘন হয়ে জন্মানো গাছপালার সারি থেকে কয়েক গজ দূরে। পূজারী সারা রাত জেগে আগুনটার উপর ডালপালা ফেলে ওটাকে জ্বালিয়ে রেখেছে। পানি খেতে আসা হাতির পালের অনাকাঙ্ক্ষিত কৌতূহল আর কাবেরীর ভয়ঙ্কর কুমীরগুলোর হাত থেকে রক্ষা করেছে তাদেরকে ওই আগুন। নদী তীরের বালুময় যে জায়গাটায় তাঁরা শুয়েছেন সেখানে সাপ আর কাঁকড়াবিছের আক্রমণের আশংকা নেই বললেই চলে। এরা এমন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করে না।

গায়ের উপর চাপানো হালকা কম্বলটা ছুঁড়ে ফেলে এন্ডারসন চা তৈরির জন্য ছোট্ট একটা কেটলি পানি ভর্তি করে আগুনের উপর চাপিয়ে দিলেন। অরণ্য আর বন্য পরিবেশে যারা ঘুরে বেড়ায় তাদের কাছে চা সব সময় আকাঙ্ক্ষিত পানীয়। পানি ফোটার ফাকে তারা নদীর কিনারায় এসে হাত-মুখ ধোয়া আর দাঁত পরিষ্কারের কাজটা করে ফেললেন।

যখন ফিরে আসলেন ততক্ষণে পানি ফুটতে শুরু করেছে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁরা চায়ের মগ হাতে নিয়ে মাখন, চাপাতি ও কলা নিয়ে নাস্তা করতে বসে গেলেন।

নাস্তা শেষ হতেই তাঁরা রাইফেলগুলো ভোরের এই পর্বত ঢালের অভিযানের জন্য প্রস্তুত করে নিলেন। এখান থেকে সিকি মাইলটাক দূর থেকে পাহাড়ী ঢালের শুরু, শেষ হয়েছে ৫,০০০ ফুটেরও বেশি উপরে পনাছিমালি নামের একটা চূড়ায়। আর সেখানে পৌঁছাতে হলে এন্ডারসনদের অতিক্রম করতে হবে ছয় মাইল পথ। এন্ডারসনের রাইফেলটা তাঁর বহু দিনের বিশ্বস্ত সঙ্গী .৪০৫ উইনচেস্টার, অন্যদিকে সঙ্গী তরুণের অস্ত্রটা আমেরিকায় তৈরি একটা ১০ শট .৩০০৬ স্প্রংফিল্ড রাইফেল।

তাঁরা যখন ক্যাম্প ছাড়লেন তখনও চারদিকে অন্ধকারের রাজত্ব। তাঁদের

পূজারী সঙ্গীও তাঁদের সাথে যেতে আগ্রহী ছিল। কিন্তু এন্ডারসন যেহেতু তাঁর তরুণ সঙ্গীকে আজ আকর্ষণীয় কিছু দৃশ্য দেখানোর চেষ্টা করবেন, তাই তিনি তাকে তাঁদের মালামাল দেখাশোনার দায়িত্বে রেখে এসেছেন। কারণ পূজারী বন্ধু বাইরা প্রকৃতিগত ভাবেই একজন শিকারী। কাজেই তিনি যখন কোনও সম্বরের পালের লম্বা শিঙের পুরুষগুলো তাঁর সঙ্গীকে দেখানোর চেষ্টা করবেন তখন সুযোগ পেয়ে এগুলোকে না মারায় বাইরা এন্ডারসনের উপর অসন্তুষ্ট হবে। আবার তিনি যখন নিজেকে বন্দুকের মুখে পেতে দিয়ে মা চিত্রল কীভাবে তার সন্তানকে আগলে রাখার চেষ্টা করে তা সঙ্গীকে দেখাবেন তখন রাইফেলের ট্রিগার টেনে মা আর বাচ্চা দুটোকেই মেরে না ফেলায় সে তাঁর উপর রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে।

একশো গজ এগুনোর আগেই ঠাণ্ডা বাতাসের পরশ পেলেন। পাহাড়টার খাড়া ঢাল বেয়ে যখন উঠতে শুরু করলেন তখন বাতাস আরও ঠাণ্ডা হয়ে আসল।

তখনও বেশ অন্ধকার, আস্তে আস্তে এগুচ্ছেন তাঁরা। পাথরে হোঁচট খাওয়া আর ঝোপ-জঙ্গল পরিষ্কার করে এগুনোর কারণে গতি আরও মন্থর হয়ে এসেছে, তারপরই প্রথমবারের মত থামতে বাধ্য হলেন। কারণ এটা জুমলুম ফল পাকার মওসুম হওয়ায় গোলাপী রঙের জুমলুম সামনের পথটাকে যেন গোলাপী একটা চাদরে ঢেকে দিয়েছে। এই মজাদার ফলের আকর্ষণে পাগলের মত ছুটে আসে শ্লথ ভাল্লুকেরা। এসময় রাতে জুমলুম গাছের খোঁজে মাইলের পর মাইল বিনা দ্বিধায় পাড়ি দেয় ওরা। এই তো গত শনিবার ক্যাম্প থেকে বড় জোর দুই ফার্লং দূরে জুমলুম গাছের একটা জঙ্গলে শ্লথ ভাল্লুকদের প্রচুর পায়ের ছাপ আর মলমূত্র দেখতে পেয়েছেন এন্ডারসন। আগের রাতেই এগুলো নীচে পড়ে থাকা গোলাপী রঙের জুমলুম ফল খেতে এখানে এসেছিল।

তাঁরা এখন যে পাহাড়ী ঢাল বেয়ে উঠছেন সেটা বনটার একেবারে কাছে। আর এই মুহূর্তে সেখানে চরে বেড়ানো ভাল্লুকগুলো সরাসরি ফিরবার পথে। স্বভাব অনুসারে ভাল্লুকগুলো ভোরের আগে যখন ঈষৎ আলোর রেখা দেখা যায়, অর্থাৎ নকল ভোরে, জুমলুম খাওয়ায় ছেদ টেনে ঢাল ধরে ফিরতে শুরু করবে। আর তাঁরা সেই সময়ের খুব কাছে। প্রকৃতির বিচিত্র খেয়াল ভোরের আগের নকল ভোরের আগমনী বার্তা পেলেন এন্ডারসন।

কিন্তু তারপরেই চারদিকের পাহাড়, অরণ্য সব কিছু আবার অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যাবে। সম্ভবত সত্যি সত্যি ভোর এবং একটা নতুন দিনের সূচনা হতে আরও মিনিট বিশেক অপেক্ষা করতে হবে।

ভোরের আগের এই নকল ভোর যে শুধু জঙ্গল অভিযানে আসা নতুন শিকারীদের ধোঁকা দেয় তা নয়, এখানকার আদি বাসিন্দাদেরও বিভ্রান্ত করে। বনমোরগ ডাকতে শুরু করে, ময়ূর জেগে ওঠে কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার জুড়ে দেয়, শিকারের খোঁজে বের হওয়া মাংসাশী প্রাণীরা ফিরে চলে তাদের গুপ্ত বাসস্থানে, মাংসাশীদের ফেলে যাওয়া শিকারের লোভে সতর্কতার সাথে তাদের অনুসরণ করা হায়েনা আর শিয়ালের দল দ্রুত ফিরতে থাকে মাটির নীচের সুড়ঙ্গ কিংবা পাথরের ফাটলে তাদের দিনের আশ্রয়ের দিকে।

বদমেজাজী আর লোভী শ্লথ ভাল্লুকের দল যারা এতক্ষণ পেটুকের মত

মাটিতে পড়ে থাকা জুমলুম ফল খাওয়ায় ব্যস্ত ছিল তারাও এই নকল ভোরের চোখ রাঙানিতে বোকা বনবে। তখনও মুখে পুরতে না পারা অবশিষ্ট ফলগুলোর মায়া ত্যাগ করে দ্রুত রওয়ানা হবে উপত্যকার দিকে, যেখানে তারা শান্তিতে বাস করে। যেখানে তারা দিনের উত্তপ্ত সময়টুকু পর্বতের সুড়ঙ্গে, ঘাসের গর্তে কিংবা পুরনো কোনও গাছের ছায়ায় আয়েশ করে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেবে।

কিন্তু হঠকারি কোনও কাজ কিংবা অসাবধানতাবশত এন্ডারসনরা কোনও অবস্থাতেই এই ঈষৎ আলোর প্রভায় নিজেদের অস্তিত্ব প্রকাশ করতে পারেন না। শুথ ভাল্লুকের আসবার শব্দ এবং ভোরের আলোয় এদের কোনও একটাকে যদি দেখতে চান তবে তাঁদের অবশ্যই লুকিয়ে পড়তে হবে। ভোরের আগের মিনিট বিশেকের এই সাময়িক অন্ধকারের আগমনে এরা বিন্দুমাত্র বিচলিত হবে না।

পৃথিবীতে বসবাসরত তাদের অন্য আত্মীয়দের মত শুথ ভাল্লুক বদমেজাজি এবং অতিরিক্ত উত্তেজনা আর কলহ প্রিয়। এমনকী কেউ দুর্ঘটনাবশত সামনে এসে পড়লে এরা বিনা দ্বিধায় তাকে আক্রমণ করে বসে। ভারতের জঙ্গলে বসবাসরত অনেক অধিবাসী হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে আসা কিংবা ঘোরাফেরা করতে থাকা শুথ ভাল্লুকের সামনে পড়ে এদের আক্রমণের শিকার হয়ে শরীরে ভয়ঙ্কর ক্ষতচিহ্ন বয়ে বেড়াচ্ছে। এদের ধারাল নখের আঘাতে অনেকেই তাদের নাক আর চোখ হারিয়েছে।

শেষ পর্যন্ত এন্ডারসনরা লুকিয়ে থাকার মত একটা পাথর খুঁজে পেলেন। উচ্চতায় চার ফুট আর লম্বায় ছয় ফুট। দুজনে এটার পিছনে গুটিসুটি মেরে বসে একটা ভাল্লুক আসার অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাঁরা এটার দেখা পেতে পারেন, আবার নাও পেতে পারেন। পর্বতে ওঠার জন্য নিঃসন্দেহে আরও অনেকগুলো বিকল্প পথ আছে। কপাল খারাপ থাকলে এগুলোর একটাও আজ এ পথ না-ও মাড়াতে পারে।

সব কিছু ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে তাঁরা নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগলেন। নিজেদের শ্বাস ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না। তারপর পাহাড়ের সমতল অংশে একটা পাথর গড়িয়ে পড়বার ক্ষীণ শব্দ শোনা গেল। কেবল মাত্র একটা প্রাণী, হয় এটার বেখেয়ালি স্বভাবের কারণে, কিংবা পাথরের ফাঁকে জন্মানো পোকামাকড়ের খোঁজ করার সময় শব্দ করে নিজের উপস্থিতি জানান দিয়েছে। নিঃসন্দেহে হরিণ নয়, কারণ ওরা অনেক সতর্ক, অবশ্যই বাঘ কিংবা চিতাবাঘও এভাবে নিজেকে জাহির করবে না। তবে হাতি হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে। কিছুক্ষণের মধ্যে প্রাণীটার পরিচয় জানা যাবে।

এবার এন্ডারসন আর তাঁর সঙ্গী জোরে জোরে শ্বাস নেওয়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছেন; যেন কোনও বৃদ্ধ লোক প্রচণ্ড পরিশ্রম করে পাহাড়ের ঢাল পার হচ্ছে। এন্ডারসন এবার নিশ্চিত হয়ে গেলেন, একটা শুথ ভাল্লুক শব্দ করে শ্বাস টানতে টানতে পাথরের সারির নীচ দিয়ে গুহার দিকে যাচ্ছে; ওগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ওটা পাথর আর ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে কীটপতঙ্গ খুঁজছে।

সত্যিকারের ভোরের আগমনের সাথে সাথে পুব আকাশ আস্তে আস্তে ফর্সা হয়ে উঠছে। তবে পাথরের পিছনে যেখানে তারা গুটিসুটি মেরে বসে আছেন

সেখানে এখনও অন্ধকারের রাজত্ব। এসময় ভাল্লুকটা পৌঁছাল। এন্ডারসনের ডান পাশে তাঁর সঙ্গী, ভাল্লুকটা তাঁর ডান পাশে; সম্ভবত দশ ফুট দূরে। সঙ্গীর হাত শক্তভাবে চেপে ধরলেন এন্ডারসন। নাড়াচাড়া না করে চুপচাপ বসে থাকার ইশারাটা ধরতে পারলেন সঙ্গী তরুণটি। অবশ্য এখনও তাদের দেখতে পায়নি ভাল্লুক, কারণ ওটার দৃষ্টিশক্তি খুব ক্ষীণ। শুধু তাই নয়, কানেও শোনে কম। তাঁরা যদি নিজেদের উপস্থিতি প্রকাশ করে দেন তা হলেই কেবল ওটা আক্রমণ করবে। এবং অযথা এই প্রাণীটাকে গুলি করার কোনও ইচ্ছে তাঁদের নেই। নাক দিয়ে ফোঁস ফোঁস আওয়াজ করে, জোরে শ্বাস টানতে টানতে তাদের পাশ কাটাল ওটা। তাঁরা কেবল ঝোপ-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এক ঝলকের জন্য কালো একটা কাঠামো দেখলেন, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা। পায়ের শব্দ ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসল।

সত্যি ভোর হচ্ছে। নদীর পুব প্রান্তে আকাশ যেন এক রঙের খেলায় মেতে উঠেছে। প্রথমে কালচে ধূসর, আর গাঢ় গোলাপী, তারপর বেগুনি, সবুজ, নীল, কমলা এবং টকটকে লাল। এক সময় দূরের পর্বতের পিছন থেকে সূর্যের গোলাকার কাঠামোটা বের হয়ে আসল।

ভোরকে স্বাগত জানিয়ে ছোট, বড়, কাছের আর দূরের পাখিরা গান গাইতে শুরু করল। শত শত বুলবুল, ব্রেইনফিভারের গানে গানে পুরো বন যেন মুখরিত হয়ে উঠেছে। নদীর কাছের নিরাপদ আশ্রয় থেকে বন মোরগের দলও ডাকতে শুরু করেছে। কাক-কায়া-কায়া-কাহুকম। বেশ কিছুটা দূর থেকে একটা ময়ূর ডেকে উঠল-মিয়াউ! মিয়াউ! মিয়াউ। তাঁরা কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছেন সঙ্গিনীকে খুশি করার জন্য ওটা পেখম মেলে নাচতে শুরু করেছে।

ক্রে-এ...এ...এক! তাঁরা শব্দটা শুনলেন, কিন্তু কেবল মাত্র একবার। বেশ ক্ষীণ, কিন্তু নিঃসন্দেহে তাঁদের ভুল হয়নি। ভারী কোনও প্রাণী পাহাড়ের উপর থেকে আসছে। হয়তোবা আরও একটা শ্লথ ভাল্লুক, যদিও এন্ডারসনের তা মনে হলো না। ভাল্লুক অনেক বেশি শব্দ করে, কিন্তু এই প্রাণী অসাবধানতাবশত প্রথমে একবার শব্দ করে ফেলার পর একেবারে নীরব হয়ে গেছে।

পাথরের উপরে শুধু মাত্র মাথার উপরের অংশ আর চোখ বের করে তাঁরা পাথরের পিছনে গুটিসুটি মেরে স্থির হয়ে বসে আছেন। জঙ্গলে লুকিয়ে থাকার প্রথম শর্ত হলো একেবারে স্থির থাকা। এমনকী যদি কোনও প্রাণী আপনাকে দেখেও ফেলে, নড়াচড়া না করায় জীবন্ত প্রাণী বলে বুঝতেই পারবে না। দ্বিতীয়টা হলো বাতাস প্রবাহিত হওয়ার দিক। বেশিরভাগ প্রাণীর বিশেষ করে হরিণদের দৃষ্টি শক্তির চেয়ে শ্রবণ শক্তি বেশি তীক্ষ্ণ। বাতাস যদি আপনার দিক থেকে সরাসরি শিকারের দিকে প্রবাহিত না হয়, আর যদি নড়াচড়া না করে একেবারে স্থির হয়ে থাকতে পারেন, তবে বনের যে-কোনও প্রাণীকেই আপনি অ্যাম্বুসের ফাঁদে ফেলতে পারবেন।

তারপরই তাঁরা ধৈর্যের পুরস্কার পেলেন। সামনের ঝোপ-জঙ্গলটায় আন্দোলন সহ বিশালদেহী একটা পুরুষ সম্বরের কাঁধ আর মাথা বের হয়ে আসল। বিশাল আকৃতির শিং দুটো দু'পাশেই চমৎকার ভাবে বেড়ে উঠেছে।

একটু আগে শ্লথ ভাল্লুকটা যেখানে ছিল সম্বরটা তার চেয়ে তাঁদের আরও

কাছে চলে এসেছে। এবং ওটা এখন তাঁদের ঠিক পিছনে। যদিও প্রাণীটা এখনও এন্ডারসনদের দেখতে পায়নি, নিছক সতর্কতার কারণেই যে পাথরটার পিছনে তাঁরা বসে আছেন তার অপর পাশের খোলা জায়গাটার দিকে এগুতে দ্বিধা করছে। তবে শেষ পর্যন্ত আগে বাড়ল। তাঁরা বিশাল আকৃতির শরীরটা দেখতে পেলেন।

এন্ডারসন এবার তাঁর সঙ্গীকে, একটা সম্বর কতটা কৌতূহলী আর অনুসন্ধানী হয়ে উঠতে পারে তা দেখানোর পরিকল্পনা করলেন। তিনি পাশের একটা ঘন ঘাসের চাপড়া নিঃশব্দে মাটি থেকে টান দিয়ে তুলে ফেললেন। ঘাসের চাপড়াটা হাতের বুড়ো আঙুল আর অন্য একটা আঙুলের মধ্যে রেখে ওটাকে এমনভাবে তুলে ধরলেন যেন কিছু অংশ পাথরের উপরে থাকে। এবার ওটাকে আঙুলের সাহায্যে ঘোরাতে শুরু করলেন। সাথে সাথেই সম্বরটার মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। শব্দহীন, আর একেবারেই সামান্য এই নাড়াচাড়াটাও ওটার দৃষ্টি এড়াল না। হঠাৎ করেই সম্বরটা দাঁড়িয়ে গেল। বিশাল আকৃতির কান দুটো দিয়ে বার বার সামনে আর পিছনে বাড়ি দিতে লাগল। অসহিষ্ণু ভাবে ডান পা উপরে তুলে হাঁটুর কাছে বাঁকা করে মাটিতে শক্তভাবে আঘাত হানল। হরিণটার খুরের সাথে পাথরের সংঘর্ষে ধাতব একটা শব্দ হলো।

এন্ডারসন যখন ঘাসের চাপড়াটাকে আবার জোরে ঘোরাতে শুরু করলেন, তখন এটা আবার পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করল। সম্বরটা ক্রমেই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠছে এবং ওটার সহজাত প্রবৃত্তি অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটছে বলে সতর্ক করে দিচ্ছে। ঘাসের চাপড়াটাকে অনেকবার বাতাসে দুলতে দেখেছে। কিন্তু কখনও এভাবে ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে দেখেনি।

বিস্মিত চোখ দুটো দেখে তাঁরা প্রাণীটা কী ভাবছে তা পরিষ্কার বুঝতে পারছেন। সহজাত প্রবৃত্তি ওটাকে দ্রুত এখান থেকে পালাতে সতর্ক করে দিচ্ছে। কিন্তু কৌতূহল হরিণটাকে অদ্ভুতভাবে ঘুরপাক খেতে থাকা আজব এই ঘাসের চাপড়াটা সম্পর্কে আরও কিছু জানতে আগ্রহী করে তুলেছে। সম্বরটা এক পা এগুলো, পুরো এক মিনিট দ্বিধা করল, তারপর আবার সামনে বাড়ল। প্রাণীটার পুরো শরীর শক্ত হয়ে আছে; এক মুহূর্তের নোটিশে ওটা পালাতে প্রস্তুত, কিন্তু সর্বগ্রাসী কৌতূহলকে কোনওভাবেই নিবৃত্ত করতে পারছে না।

হরিণ আর অ্যান্টিলোপ গোত্রের প্রাণীদের এই কৌতূহলপ্রবণতার কারণে প্রতি বছর অভিজ্ঞ চোরাশিকারীদের হাতে ওগুলো হাজার হাজারে মারা পড়ছে। এসব চোরাশিকারী এদের কৌতূহলী করে তোলার জন্য এখন এন্ডারসন যা করেছেন ঠিক তা কিংবা অন্য কোনও পদ্ধতির আশ্রয় নেয়, সেই সাথে এদের নিয়তি নির্ধারিত হয়ে যায়। সম্বরটা এখন এত কাছে চলে এসেছে যে তাঁরা একটা বর্শা দিয়ে সহজেই গেঁথে ফেলতে পারবেন। আরও কাছে চলে আসছে। এই বোকা প্রাণীটার অবশ্যই একটা শিক্ষা হওয়া দরকার।

পাথরের পিছনে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে পুরো শক্তিতে চিৎকার করতে শুরু করলেন এন্ডারসন–রুফ! রুফ! রুফ!

বাঘের কণ্ঠধারী একজন মানুষের ভীতিকর উপস্থিতি সম্বরটাকে একই সাথে বিস্মিত আর আতংকিত করে তুলল। চমকে উঠে পিছনের পায়ের উপর ভর দিয়ে

দাঁড়িয়ে গেল ওটা, তারপরই পাথরে হোঁচট খেয়ে হাঁটু ভেঙে পড়ল। আবার কোনওভাবে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বিপদ সঙ্কেত দিতে শুরু করল।

'ও...অনক।' গলা ফাটিয়ে চেঁচাল প্রাণীটা।

তারপর গাছপালার ভিতর দিয়ে পাহাড় বেয়ে পিছনে নামতে শুরু করল। তাঁরা তাঁকে অনুসরণ করতে পারেন, এ আশংকায় ছোট বড় অসংখ্য পাথর ছিটিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে দৌড়াতে শেষ পর্যন্ত নদী তীরের গভীর জঙ্গলের ভিতর আশ্রয় নিল, যেখানে পালের অন্য হরিণগুলো সতর্ক ভাবে অপেক্ষা করছে। যদি প্রাণীটা আক্রান্ত হত তবে পাহাড়ে গুটিসুটি মেরে লুকিয়ে থাকা মৃত্যু সম্পর্কে প্রাণীটার দেয়া বিপদ সংকেত শেষ করার দায়িত্ব চাপত তাদের ঘাড়ে।

'ও-অনক! চা-এনক!' কর্কশ শব্দে আবার সতর্ক সংকেত দিল ওটা; তারপর আবার, আবার।

জুমলুম বনে খেতে থাকা লেঙ্গুর বানরদের প্রহরীর মধ্যেও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তে দেরি হলো না। এন্ডারসনরা যেখানে লুকিয়ে আছেন সেখান থেকে ওটাকে আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে। একটা গাছের মাথায় দুই পায়ের উপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সম্বরের ঘোষণা করা বিপদটাকে উৎসুক দৃষ্টিতে খুঁজছে। কিন্তু প্রচণ্ড চেষ্টার পরেও ওটা এন্ডারসনদের দেখতে ব্যর্থ হলো। নিশ্চিতভাবে এটা বিস্মিত হয়েছে এবং বিপদের প্রকৃতি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাচ্ছে। তারপর বিশাল আকৃতির লেঙ্গুরটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাল। তাকে অবশ্যই তার দায়িত্ব পালন করতে হবে। সম্বরটার সাথে সাথে সতর্ক সংকেত দিয়ে তার দলের সদস্যদের এবং বনের অন্য প্রাণীদের উপস্থিত বিপদ সম্পর্কে সাবধান করে দিতে হবে।

'হার!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বিপদ সংকেত দিল সে। এক মুহূর্ত নীরবতার পর আবার সংকেত দিতে শুরু করল, 'হার! হার–হার।

নদীর অন্য প্রান্তে তৃষ্ণা মিটাতে আসা একটা ভেড়া পানি খাওয়ার চিন্তা বাদ দিয়ে ভয়ার্ত গলায় কুকুরের মত খার! খার! ডাক ছাড়তে ছাড়তে পালাল।

এন্ডারসনরা পাহাড়ের যে ঢালে লুকিয়েছেন তার অপর প্রান্তে চিত্রলের একটা দল চরছিল, ক্রমাগত ধারাবাহিক বিপদ সংকেত শোনার সাথে সাথে একে অপরকে সতর্ক করে দিল; আইঅউ! আইঅউ!

ঘটনাস্থল থেকে বেশ কিছুটা দূরে থাকা একটা হাতি চারদিক প্রকম্পিত করে চিৎকার করে উঠল।

পুরো বন এক সময় শান্ত হয়ে আসল। এবং তাঁরা আবার যাত্রা শুরু করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এখানে লুকিয়ে থেকে আর কোনও লাভ হবে না; সম্বরটা পুরো বনে এত বেশি আলোড়ন তুলেছে যে এই মুহূর্তে এই পথে আর কোনও প্রাণী আসার সম্ভাবনা নেই।

জঙ্গলে যাঁরা ঘোরাফেরা করতে অভ্যস্ত তাঁরা সম্ভবত এক ধরনের ঝোপ দেখে থাকবেন যেগুলোর পাতা দেখতে অনেকটা চা পাতার মত। এন্ডারসনদের আশপাশে এ ধরনের ঝোপ গাছ প্রচুর পরিমাণে আছে। এগুলো স্থানীয়ভাবে পরিচিত ভেলারি গাছ নামে। বাতের ব্যথা এবং যে-কোনও ধরনের আঘাতজনিত

ক্ষত ভাল করতে এর পাতার মত কার্যকর ওষুধ কমই আছে। ঝোপ গাছগুলোর একটা জাত বেশ বড় হয়। এগুলোর পাতার উপরের সবুজ আর নীচের রূপালী-সাদা অংশ যে-কোনও ধরনের আঘাত আর ক্ষত সারিয়ে তুলতে চমৎকার কাজ করে। তবে তাদের সামনের শক্ত মাটিতে যে জাতের ভেলারি গাছ রয়েছে, আকৃতিতে বেশ ছোট্ট, টেনেটুনে এক ফুট হবে। এগুলোর ধারালো রূপালী-ধূসর পাতা সাপের কামড়ের এক মোক্ষম দাওয়াই হিসেবে পরিচিত। ওই যে খাজ কাটা পাতা আর ডেইজি ফুলের মত দেখতে সাদা ফুল ফুটে থাকা ছোট গাছটা দেখা যাচ্ছে, রক্ত পড়া বন্ধ করতে ওটা রীতিমত ওস্তাদ। সাধারণত এর পাতা নিংড়ে রসটা ক্ষতস্থানের উপর লাগিয়ে দেয়া হয়। এটা ডাক্তারের লিখে দেয়া কোনও ওষুধের মতই। দক্ষতার সাথে উচ্চ রক্তচাপ দ্রুত কমিয়ে দিতে পারে।

আসলে জঙ্গল এমন সব বৃক্ষ আর গুল্মে ভর্তি যাদের পাতা, বীজ, ফুল এমনকী কাণ্ড মানুষ আক্রান্ত হয় এমন অসংখ্য জটিল রোগ আর আঘাতের মহৌষধ।

আবার জঙ্গলে প্রায়ই গোলাপী আর সবুজ একরকম চমৎকার ফুল আপনাদের চোখে পড়বে যেগুলো বের হয় সবুজ পাতার ভারতীয় পেরিউইনকল গুল্ম থেকে। রেলওয়ের নিজস্ব এলাকাগুলোতেও এদের প্রচুর দেখা যাবে। এই গাছের পাতা চা-এর মত গুড়ো করে প্রতিদিন বড় এক কাপ পানি কিংবা দুধের সাথে মিলিয়ে খেলে ইনসুলিন ক্ষরণ হ্রাস পায় অর্থাৎ ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে।

ইতিমধ্যে হাঁটতে হাটতে তারা পর্বতের চূড়ায় পৌছে গেছেন। তারপর অন্য প্রান্তের ঢাল ধরে নামতে শুরু করলেন। তাঁরা এখন খুব সতর্কতার সাথে এগুচ্ছেন। কারণ ঢালটা প্রচণ্ড খাড়া এবং তাঁদের কারও পায়ে লেগে যদি কোনও পাথর গড়িয়ে পড়ে কিংবা অন্য কোনভাবে শব্দ হয় তবে ডাকাডাকি বন্ধ করে শান্ত হয়ে আসা চিত্রল হরিণের দল সতর্ক হয়ে যাবে, আর তাঁরা ওগুলোকে দেখার সুযোগ হারাবেন। ভাগ্যক্রমে বাতাস এখন পাহাড়ের উপর দিকে বইছে, এতে করে ওগুলো তাদের শরীরের গন্ধ পাবে না।

তাঁরা পাহাড়ের নীচে পৌছে গেলেন। তারপর চারপাশের গুল্ম, কাঁটাঝোপ আর ল্যান্টানার মধ্য দিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুলের উপর ভর দিয়ে একটা ঘাসপূর্ণ খোলা জায়গার কিনারায় এসে দাঁড়ালেন। সেখানে কমপক্ষে চল্লিশটা চিত্রলের একটা দল শান্ত ভাবে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে। ভাগ্যক্রমে দলের কেউ অবাঞ্ছিত অতিথির আগমনের আশংকায় প্রহরীর দায়িত্ব পালন করছে না, এবং সময়মত তাঁরা ছোট রেডউড গাছের একটা জঙ্গলের পিছনে আশ্রয় নিতে পেরেছেন।

সামনের দৃশ্যটা মনোমুগ্ধকর। বিশাল বাঁকানো শিংধারী পুরুষগুলো দলের মাঝখানে, প্রতিবার খাওয়া শুরুর আগে গর্বিত মাথাটাকে ঝাঁকিয়ে নিচ্ছে আর নাক দিয়ে গন্ধ শুঁকে সাক্ষাৎ যমদূত হিংস্র কোনও মাংসাশী প্রাণী আশপাশে লুকিয়ে আছে কিনা বুঝে নেয়ার চেষ্টা করছে। চতুর্দিক থেকে তাদেরকে ঘিরে আছে পালের মহিলা আর বাচ্চাগুলো। ক্ষীণ কোনও শব্দও যেন এড়িয়ে না যায় সেজন্য মাদী হরিণগুলো তাদের কান সামনের দিকে টানটান করে রেখেছে, হঠাৎ করেই মাথা আর গলাটা নামিয়ে এক দলা ঘাস কিংবা পাতা মুখে পুরে নিচ্ছে, কিন্তু

তারপরই দ্রুত মাথাটা তুলে ফেলছে। প্রচণ্ড পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা সম্পন্ন, সব সময় সতর্ক।

বাচ্চাদের এ-ধরনের কোনও দায়দায়িত্ব কিংবা পূর্বসতর্কতা নেই। 'প্রতি মুহূর্তে প্রচণ্ড সতর্ক থাকা, যে-কোনও দিক থেকে গুটিসুটি মেরে মৃত্যু এগিয়ে আসতে পারে'–জঙ্গলে টিকে থাকার এই মূলমন্ত্র শেখবার আগেই অনেক হরিণ শিশুকে হিংস্র মাংসাশী প্রাণীর অসহায় শিকারে পরিণত হতে হয়।

এগুলো তিড়িং বিড়িং নাচছে, নিজেদের মধ্যে খেলাচ্ছলে একটা আরেকটাকে তাড়া করছে, কোনও কোনওটা আবার মায়ের স্তনে মুখ ডুবিয়ে দুধ পান করছে। মা মাঝে মাঝেই বাচ্চাগুলোকে দুধ খাওয়ানো থামিয়ে দিয়ে পরম মমতা আর ভালবাসায় এদের শরীর চেটে দিচ্ছে। তবে এত কিছুর মধ্যেও যে মাংসাশী প্রাণীর খোঁজে চারদিকের জঙ্গল পর্যবেক্ষণে বিরতি দিচ্ছে না। তার চোখ অরণ্যের প্রতিটি দিকে সতর্ক নজর রাখছে, ক্ষীণ শব্দও শোনার জন্য কানগুলো প্রস্তুত, আর নাক যে-কোনও ধরনের বিপদের গন্ধ নেয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।

হরিণগুলো যেখানে চরে বেড়াচ্ছে, তার সরাসরি উপরে একটা গাছে লেঙ্গুর বানরের ছোট একটা দল আস্তানা গেড়েছে। এদের মধ্যে দুটো লেঙ্গুর লাফ দিয়ে নীচে নেমে এসে খেলার ছলে একটা হরিণ শিশুকে তাড়া করল। তারপর একটা গাছের ডালে লাফিয়ে উঠে পড়ল। পা দিয়ে ডালটাকে আটকে ধরে ঝুলে থাকল। তারপর লেজের সাহায্যে হরিণের বাচ্চাটাকে মাটি থেকে অর্ধেক উপরে তুলে ফেলল। বাচ্চা খেলাটা পছন্দ করলেও, তার মা পছন্দ করল না।

আপাত দৃষ্টিতে প্রচণ্ড সুন্দর আর পরম শান্তিময় একটা দৃশ্য। কিন্তু এন্ডারসন আর তাঁর সঙ্গীর চোখের কোণে বাম পাশে কিছুটা দূরে বড় একটা ঝোপের মধ্যে মৃদু একটা নড়াচড়া ধরা পড়েছে। তাঁরা ঝোপটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেছে।

ঝোপটার কাছেই বাচ্চা নিয়ে চরতে থাকা একটা মা হরিণও এটা দেখেছে। ঝোপটাকে ভাল ভাবে দেখার জন্য সে মাথাটা উঁচু করল, অস্বাভাবিক কোনও শব্দের আশায় কান দুটো খাড়া করে ফেলল, আর নাক দিয়ে জোরে শ্বাস টানল। তারপর সে তার ডান পা দিয়ে মাটিতে আঘাত হানল এবং তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রথম সতর্ক সংকেত দিল, 'আইও!'

কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। সকালের সূর্যের আলোয় সোনালি ডোরাকাটা একটা দীর্ঘ শরীর ঝোপটার ভিতর থেকে লাফ দিল এবং দুই লাফে এটা ছোট বাচ্চাটার কাছে পৌঁছে গেল। পরমুহূর্তেই অসহায় প্রাণীটা চিতাবাঘটার হাতে মারা পড়ল। কান ফাটানো শব্দে গর্জাতে গর্জাতে এটা ঈষৎ কাঁপতে থাকা দেহটার দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইল।

তারপরই তাঁরা এমন একটা দৃশ্য দেখলেন যা এক দিক থেকে যেমন মর্মস্পর্শী, তেমনি অসাধারণ। বাচ্চাটার মা নিজের বিপদের কথা ভুলে গিয়ে তার সন্তানের হত্যাকারীর মুখোমুখি হতে ছুটে গেল। চিতাবাঘটা ছোট্ট মৃতদেহটাকে ছেড়ে এবার মা হরিণটার উপর লাফিয়ে পড়ল। তারপর প্রাণীটার গলা কামড়ে ধরে মাটির সাথে শুইয়ে ফেলল। মৃত্যুযন্ত্রণায় তার খুরগুলো বারবার সবুজ ঘাসের

উপর আঘাত হানছে। ইতিমধ্যে প্রাণীটার ক্ষত-বিক্ষত গলা থেকে বের হয়ে আসা রক্তে আশপাশের ঘাস লাল বর্ণ ধারণ করেছে।

এন্ডারসন দেখলেন তাঁর সঙ্গী এখনও গর্জাতে থাকা চিতাবাঘটার দিকে তাঁর ১০-শট স্প্রিংফিল্ড রাইফেলটা তুলছে। এই মাত্র ঘটে যাওয়া নারকীয় হত্যাকাণ্ড দুটোর প্রতিশোধ নিতেই যে সে কাজটা করছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি তাঁর একটা হাত বাড়িয়ে রাইফেলটা ধরে ফেললেন এবং তাঁর নিশানা ব্যর্থ করে দিলেন।

'গুলি কোরো না, জন! এটাই জঙ্গলের আইন। চিতাবাঘটা খাবার জন্য হত্যা করেছে, নিছক আনন্দ পাবার জন্য নয়।'

চিতাবাঘটা তাঁর কণ্ঠ শুনেছে। সে তাঁদের দিকে তাকাল। পর মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল। তবে আবার ফিরে আসবে ওটা।

দিগুভামুট্টার গুপ্তঘাতক

আপনি যদি অন্ধ্রপ্রদেশের গুনটাকাল জংশন স্টেশন থেকে মিটার গেজ রেলে দক্ষিণ-পুবে যাত্রা করেন, নানদিয়াল শহর অতিক্রম করে একটু এগুলেই পৌঁছে যাবেন অসাধারণ সুন্দর বিস্তীর্ণ এক পাহাড়ের রাজ্যে। দু'পাশে গহীন অরণ্য ও পাহাড়ের বুক চিরে নেমে এসেছে একটার পর একটা পাহাড়ী ঝর্ণা। অরণ্য স্টেশন বাসাভাপুরাম ও চিলামে বেশ কিছুটা সময় অপেক্ষা করে ঘড় ঘড় শব্দ তুলে ট্রেনটা একে একে অতিক্রম করবে দুটি অন্ধকার সুড়ঙ্গ, যার একটি ছোট হলেও, অন্যটি বেশ বড়। তারপরই সবুজ একটা উপত্যকায় পৌঁছে যাবেন আপনি। উপত্যকার বুক ভেদ করে ঝকঝকে ছবির মত পথটা ধরে ট্রেনটা যখন এগুবে, অনেক নীচের বৃক্ষশীর্ষগুলো আপনাকে স্বাগত জানাবে। আরও কয়েক মাইল এগুবার পর রেললাইনের ডান পাশে বিশাল এক পাথরের পানির ট্যাংকের দেখা পাবেন, সেটা থেকে সারাক্ষণ উপচে পড়ছে পানি। এর পরপরই একটা আউটার রেল সিগন্যাল দিগুভামুট্টা রেলওয়ে স্টেশনের আগমনী বার্তা ঘোষণা করছে। দিগুভামুট্টা স্টেশন থেকেই পাহাড় ও অরণ্য বিদায় নিয়েছে, শুরু হয়েছে সমতল চাষের জমি।

চিলাম ও দিগুভামুট্টার মধ্যবর্তী এই বিস্তৃত অরণ্যের উপর সবসময়ই বিখ্যাত শিকারী কেনেথ এন্ডারসনের একটা বিশেষ দুর্বলতা ছিল। তবে তাঁর এই দুর্বলতা এখানকার অরণ্যে মাংসাশী ও তৃণভোজী প্রাণীর প্রাচুর্যের জন্য নয়, বরং এখানকার সীমাহীন শান্ত পরিবেশ, ও নির্জনতার জন্য। পাশাপাশি ইস্টার্ন ঘাটের অন্তর্গত এই জঙ্গলে বসবাসরত চেনচু আদিবাসীদের বন্ধুভাবাপন্ন স্বভাব এবং আচরণও তাঁকে প্রচণ্ডভাবে আকর্ষণ করে। তা ছাড়া, এখানকার অরণ্যের প্রকৃতি আরও দক্ষিণের অরণ্যগুলো থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়ায় এবং হাতী ও বাইসনের বসবাস না থাকায় বাইসন গোত্রের বিশালদেহী প্রাণী নীল গাইদের এ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

কাজেই একদিন বেডরোল, ক্যাম্প করার উপযোগী অন্যান্য জিনিসপত্র ও তার বিশ্বস্ত রাইফেলটা সাথে নিয়ে এন্ডারসন দিগুভামুট্টাগামী ট্রেনে চেপে বসলেন। বরাবরের মতই, লম্বা সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে তারপর ব্রিজের উপর দিয়ে যাবার সময় বাচ্চাদের মত উত্তেজিত হয়ে পড়লেন তিনি। একে একে উপচে পড়া পানির ট্যাংক ও আউটার সিগন্যালকে পাশ কাটিয়ে ট্রেন দিগুভামুট্টা পৌঁছাতেই নিজের মাল-সামান সাথে নিয়ে স্টেশনে নেমে পড়লেন এন্ডারসন। তারপর রেললাইনের সমান্তরাল এগিয়ে চলা রাস্তা ধরে যেদিক থেকে ট্রেন এসেছে সেদিকেই হাঁটতে অরম্ভ করলেন।

এখান থেকে ফরেস্ট বাংলোটা আনুমানিক আধ মাইল দূরে। বাংলোটার দক্ষিণ অংশে সেগুন বাগান, পুবে ও উত্তরে ঘন জঙ্গল, পশ্চিমে রেল স্টেশনের

দিকে চলে যাওয়া রাস্তা। আউটার সিগন্যাল ও পানির ট্যাঙ্কটাও বাংলো থেকে মাত্র আধ ফার্লং দূরে। বাংলোর কেয়ারটেকার ও এন্ডারসনের পুরোন বন্ধু আলিম খান এগিয়ে এসে হাসিমুখে তাকে অভ্যর্থনা জানাল।

দুই কামরার বাংলোর অপেক্ষাকৃত ভাল কামরাটা তাঁকে দেয়া হয়েছে দেখে এন্ডারসন খুশি হয়ে উঠলেন। রাস্তা ও রেলস্টেশনের দিকে মুখ করা কামরাটার সাথে বাথরুমে গোসল করারও ব্যবস্থা আছে, সেটা এ মুহূর্তে তার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

চমৎকার একটা গোসল শেষে কাপড় বদলে তিনি বারান্দার আর্মচেয়ারটাতে গা এলিয়ে দিলেন। তারপর আস্তে-ধীরে পাইপটা ধরিয়ে মগের পর মগ চা শেষ করতে লাগলেন। একটু পরেই মাটিতে জুতোর খট খট শব্দ তুলে এন্ডারসনের আর্মচেয়ারটার পাশে এসে দাঁড়াল আলিম এবং তার পরিবারের বিভিন্ন সমস্যার কথা বলতে আরম্ভ করল। তার একমাত্র বোনের ফরেস্ট গার্ড স্বামী যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে হঠাৎ করেই মারা যায়। দুই সন্তান সহ সে আলিমের কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছে। এদিকে আলিম নিজেও দুই বিয়ে করেছে। প্রথম স্ত্রীর ঘরে তিন সন্তান ও দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে দুই সন্তান। চারজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ ও সাতটা ছেলে-মেয়ের খাওয়া-পরার সমস্ত খরচ তার একার আয়েই চালাতে হচ্ছে।

এন্ডারসন কি আলিমের জন্য কিছু করতে পারেন? তারপর সে নিচু গলায় তাকে জানাল, দুই সন্তানের মা হবার পরেও তার বোন এখনও রীতিমত তন্বী তরুণী, সে দেখতে ভাল ও তার ফিগারও যথেষ্ট আকর্ষণীয়। এমনকী তার ব্যবহারও চমৎকার, একজন আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য স্ত্রী হবার জন্য যে সমস্ত গুণাবলী প্রয়োজন সবই তার মধ্যে বিদ্যমান।

আলিম যে তার বোনের সম্ভাব্য পাত্র হিসাবে তাঁকেই কল্পনা করতে শুরু করেছে, এটা বুঝতে এন্ডারসনের বিন্দুমাত্র কষ্ট হলো না। এই বিপদ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য তিনি তাকে কথা দিতে বাধ্য হলেন, ব্যাঙ্গালোর ফিরে গিয়ে তিনি তার বোনের জন্য সুপাত্রের খোঁজ করবেন। তারপর তিনি দ্রুত প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে জানতে চাইলেন সম্প্রতি এ এলাকায় কি কোনও বাঘ কিংবা চিতাবাঘ দেখা গেছে?

আলিম এন্ডারসনকে একটা গোপন তথ্য দিল। দিন দশেক আগে কয়েকজন সরকারী কর্মকর্তা জিপে করে সার্চ লাইটের সাহায্যে রেস্ট হাউজ থেকে প্রায় একশো গজ দূরে বন বিভাগের *ফায়ার লাইনে গুলি করে একটা বাঘ শিকার করে। ফায়ার লাইনটা পশ্চিম থেকে পুব দিকে বিস্তৃত। বাংলো থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে এক ফার্লং দূরে একটা রাস্তা থেকে শুরু হয়ে এটি পুব দিকে দুই মাইল দূরের একটা রাস্তার সাথে মিশেছে। একটা চিতাবাঘের কথাও এন্ডারসনকে জানাল আলিম। চিতাবাঘটা ইতিমধ্যে সমস্যার কারণ হয়ে উঠেছে। বাংলোর আশপাশে প্রতিদিন সকালে এটায় পায়ের ছাপ পাওয়া যায়। সপ্তাহ তিনেক আগে

* বনের যে অংশের গাছপালা আগুনে পুড়ে গেছে।

বাংলোর পিছনের বারান্দায় ঘুমিয়ে থাকা আলিমের কুকুরটাকে তুলে নিয়ে গেছে।

তারপর সে জানাল তার বোন সাথে করে একটা কুকুরও নিয়ে এসেছে, এবং কয়েকদিন আগে যে ঘরে আলিমের বোনের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে তার দরজার সামনে চিতাবাঘটা এই কুকুরটাকেও আক্রমণ করে বসে। তবে গ্রামের সাধারণ নেড়ি কুকুরের তুলনায় বেশ বড় ও সাহসী এই কুকুরটা এমন ভয়ঙ্করভাবে চিতাবাঘটার মুখোমুখি হয় যে ওটা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় আলিম ও তার বোন পুরো ঘটনাটাই দেখতে পায়।

তবে ঘটনাটা আলিমকে আশ্বস্ত করতে পারেনি। তার ধারণা, যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করতে পারলে চিতাবাঘটা আবার ফিরে আসবে এবং কুকুরটাকে নিয়ে যাবে। আলিমের দুশ্চিন্তা নিজের ও তার বোনের সাতটা ছেলে-মেয়েকে নিয়ে–যাদের মধ্যে মাত্র দুটো বাচ্চা কেবল হামাগুড়ি দিতে শিখেছে। চিতাবাঘটা যদি অতিরিক্ত সাহসী কিংবা ক্ষুধার্ত হয়ে ওঠে, তবে এটা হয়তো বা কোনও একটা বাচ্চাকে ধরে নিয়ে যেতে পারে।

একটু পরেই একটা সাইকেলে চেপে ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসারের আগমন ঘটল। তিনি আলিমকে জানাতে এসেছেন ডিস্ট্রিক ফরেস্ট অফিসার দিগুভামুট্টা অতিক্রম করার পথে আগামী রাতটা এখানেই কাটাবেন। তারপরই তিনি এন্ডারসনকে জিজ্ঞেস করলেন বাংলোয় থাকার জন্য তাঁর কি কোন লিখিত অনমুতি আছে?

এন্ডারসন যখন জানালেন তাঁর এ ধরনের কোনও অনুমতি নেই, তখন রীতিমত হতভম্ব হয়ে পড়লেন রেঞ্জ অফিসার। এন্ডারসন ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছেন, তিনি বিনা অনুমতিতে একটা সরকারী বাংলোতে অবস্থান করেছেন। এন্ডারসনকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করে তিনি জানালেন, তাঁকে এখনই বাংলোটা ছেড়ে যেতে হবে।

আবার সেই একই সমস্যা। ভারতের বিভিন্ন জঙ্গলের ফরেস্ট বাংলোগুলোতে অসংখ্যবার তাঁকে যে সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। আর এ কারণেই কর্তৃপক্ষের ঝামেলা এড়িয়ে শান্তিতে ক্যাম্প করার জন্য তিনি ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য জমি কিনে রেখেছেন।

এই মুহূর্তে হঠাৎ করেই বাংলো ছাড়তে হলে তাঁকে বেশ সমস্যায় পড়তে হবে চিন্তা করে এন্ডারসন রেঞ্জ অফিসার সম্পর্কে অযাচিতভাবে নানানরকম প্রশংসাসূচক কথা বললেন। নিজের প্রশংসা শুনতে কার না ভাল লাগে! রেঞ্জ অফিসার বেচারা কিছুক্ষণের মধ্যে পুরোপুরি গলে গেলেন। এক পর্যায়ে স্বীকার করলেন, যে সমস্ত সিনিয়র অফিসার ট্যুরে আসেন তাঁরা আসলেই খুব বিরক্তিকর। বস্তুত্যিকার অর্থে এসব অফিসাররা নিজেরা কোনও কাজই করেন না, তাঁকে এবং তাঁর সহকারীদেরই সমস্ত কাজ করতে হয়। আর আগামীকাল ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসারের দিগুভামুট্টা আসবার একমাত্র উদ্দেশ্য বাট্টা (অফিসাররা বিশেষ ধরনের যে ভ্রমণ ভাতা পান) সংগ্রহ। তারপর তিনি তাঁকে জানালেন, আজ রাতটা এন্ডারসন অবশ্যই এখানে কাটাতে পারেন, তবে তাঁকে কথা দিতে হবে যে কাল দুপুরের আগেই তিনি বাংলো ছেড়ে দেবেন। কারণ ওই বজ্জাত ডি.এফ.ও

অনুমতি ছাড়া তাঁকে বাংলোতে থাকতে দেখলে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

কাল দুপুরের আগেই চলে যাবেন, রেঞ্জ অফিসারকে এই বলে আশ্বস্ত করে এন্ডারসন গ্রামের কোথাও থাকার মত একটা কামরা পাওয়া যাবে কিনা জানতে চাইলেন। কিন্তু রেঞ্জ অফিসার এমন কোনও জায়গার হদিস দিতে পারলেন না। আলাপচারিতার এক পর্যায়ে এসে এন্ডারসন তাঁকে জানালেন বিভিন্ন জায়গায় একই সমস্যার মুখোমুখি হওয়ায় তিনি ভারতের বহু জঙ্গলে রাত কাটানোর জন্য ছোট ছোট জায়গা কিনতে আরম্ভ করেছেন, এবং এ মুহূর্তে তাঁর এমন বিশটার বেশি ক্যাম্প সাইট আছে। এই প্লট কেনার কথা শুনে রেঞ্জ অফিসার উৎফুল্ল হয়ে উঠে জানালেন তাঁর এক বন্ধু আছে রেভিনিও ডিপার্টমেন্টে যার রেল লাইনের পাশে বেশ কিছু জমি আছে। তিনি যদি অনুরোধ করেন তবে নিশ্চিত ভাবেই তাঁর বন্ধু রেড্ডি এন্ডারসনকে ক্যাম্প করার জন্য এক টুকরো জমি দেবে, এবং এর জন্য সে কোনও পয়সাও নেবে না।

এক ঘণ্টার মধ্যে তাঁরা রেঞ্জারের সেই বন্ধুর বাড়িতে পৌঁছে গেলেন। রেড্ডি তাঁদেরকে তার জমির কাছে নিয়ে আসল। রেড্ডি এন্ডারসনকে তার সুবিধামত যতটুকু জায়গা প্রয়োজন বেছে নিতে বলল। এন্ডারসন জমিটার একপ্রান্তে অনাবাদী ছোট্ট এক টুকরো জমি বাছাই করলেন। জমিটার পাশ দিয়েই একটা ঝর্ণা চলে গেছে। ঠিক হলো রেড্ডি নিজে জিপে করে এন্ডারসনকে কাল বারো মাইল দূরের গিড্ডালুরে নিয়ে যাবে। এখানেই এন্ডারসনের নামে জমিটি রেজিস্ট্রেশন করা হবে। রেড্ডি জমিটার মূল্য বাবদ কিছু নিতে অস্বীকৃতি জানালেও, এন্ডারসন জানালেন এটা কোনও ভাবেই বৈধ হবে না, কাজেই তাঁকে অবশ্যই জমির মূল্য বাবদ কিছু টাকা গ্রহণ করতে হবে। শেষ পর্যন্ত, অনেক তর্কাতর্কির পর, রেড্ডি জমিটার মূল্য বাবদ ত্রিশরূপী নিতে রাজী হলো।

সেদিন সন্ধ্যার ঘটনা। এন্ডারসন আস্তে আস্তে পা ফেলে কয়েকদিন আগে যেখানে বাঘটা শিকার করা হয়েছে সেই ফায়ার লাইনটা থেকে রেস্ট হাউজের দিকে ফিরছেন। ফায়ার লাইনটা এক জায়গায় এসে গভীর একটা নালাতে নেমে গেছে। ঝর্ণার থেকে শুরু নালাটার প্রশস্ততা কমে এই শুকনো মৌসুমে গজ খানেকে নেমে এসেছে। অপ্রশস্ত নালার দু'পাশের নরম গাদা মাটিতে গভীরভাবে ফুটে আছে মাঝারি আকৃতির একটা চিতাবাঘের পায়ের ছাপ। তার স্বগোত্রীয় অন্যদের মতই পানির উপর দিয়ে হেঁটে যেতে ইচ্ছুক না হওয়ায় চিতাবাঘটা লাফ দিয়ে নালা অতিক্রম করেছে।

এন্ডারসন অনুমান করলেন আলিম যেটার কথা বলেছে এটা সেই প্রাণীটাই। বনবিভাগের বাংলোর দিকে চলে যাওয়া পায়ের ছাপটা সম্ভবত গত রাতে তৈরি। কিন্তু সামনের দিকে ঝুঁকে আরেকটু কাছ থেকে পায়ের ছাপগুলো পর্যবেক্ষণ করতেই তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। এন্ডারসনের ধারণামত চিতাবাঘটা যদি গত রাতেই নালা অতিক্রম করে থাকে, তবে নালার দুই তীরে পানির কিনারায় জন্ম নেয়া গাঢ় সবুজ রঙের ছত্রাক চিতাবাঘটার পায়ের চাপে এখনও এত গভীরভাবে ডেবে আছে কেন? পুরো একটা দিনও কি ডেবে যাওয়া ছত্রাকগুলোর

আগের অবস্থায় ফিরে আসার জন্য যথেষ্ট নয়? এর একটাই সমাধান–চিতাবাঘটা মাত্র এক কি দুই ঘণ্টা আগে নালা অতিক্রম করেছে।

এখন সন্ধ্যা ছয়টা বাজে, কাজেই প্রাণীটা নিঃসন্দেহে সূর্যাস্তের আগেই চারটে থেকে পাঁচটার ভিতরে কোনও এক সময় নালাটা অতিক্রম করেছে। রেললাইন অতিক্রম করে এটা যদি পানির ট্যাঙ্কের দিকে না গিয়ে থাকে, তবে এই মুহূর্তে বাংলোর আশপাশের জঙ্গলেই আছে। এন্ডারসন আবার বাংলোর দিকে ফিরে চললেন।

বাংলোয় ফিরে সেদিন একটু তাড়াতাড়িই ডিনারে বসলেন তিনি এবং তখনই ঘটনাটা ঘটল। ঘড়ির কাঁটা ঠিক পৌনে আটটা নির্দেশ করছে। সময়টা এন্ডারসন পরিষ্কারভাবে স্মরণ করতে পারছেন, কারণ তিনি ঠিক তখনই ঘড়ি দেখেছিলেন, খাওয়া শুরুর সময় ঘড়ি দেখা তাঁর অনেকদিনের পুরানো অভ্যাস। আলিমের বোনের কুকুরটা এন্ডারসনের চেয়ারের উপর দুই পা তুলে দিয়ে প্লেটের অবশিষ্টাংশ পাবার আশায় একদৃষ্টিতে এন্ডারসনের দিকে তাকিয়ে ছিল। তিনি এক টুকরো শুঁকনো চাপাটি দিলেন কুকুরটাকে। নির্জনে কোথাও বসে খাবার জন্য কুকুরটা চাপাটিটা মুখে নিয়ে বারান্দার দিকে দৌড়ে গেল এবং এর পরেই মৃদু একটা গর্জন শুনলেন এন্ডারসন। পরমুহূর্তে কুকুরটার তীক্ষ্ণ কণ্ঠের আর্তনাদ শোনা গেল।

এন্ডারসনের রাইফেলটা বেডরুমেই রয়ে গেছে। কিন্তু চিতাবাঘটার হাত থেকে কুকুরটাকে বাঁচাতে হলে সময় নষ্ট করার কোনও সুযোগ নেই। রাইফেল ছাড়াই তিনি বারান্দার দিকে দৌড়ে গেলেন এবং চাঁদের আলোয় ডোরাকাটা কাঠামোটাকে বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে পড়তে দেখলেন– ওটার কঠিন চোয়ালের ফাঁকে আটকে থাকা কুকুরটা তখনও মুক্তির জন্য ছটফট করছে।

চিতাবাঘটাকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্য তিনি জোরে চিৎকার দিয়ে উঠলেন, তারপর বারান্দার একটা কাঠের চেয়ার তুলে নিয়ে ওটার দিকে ছুঁড়ে মারলেন। চেয়ারটা উড়ে গিয়ে চিতাবাঘের গায়ের উপর পড়ল। কিন্তু এই সামান্য আঘাত ওটাকে দমাতে পারল না। কুকুরকে মুখে নিয়েই জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়ল বাঘ।

এন্ডারসন দৌড়ে এসে বেডরুম থেকে রাইফেলটা তুলে নিলেন এবং দ্রুত গুলি ভরে বাঘটা যেদিকে অদৃশ্য হয়েছে সেদিকে দৌড় দিলেন। চাঁদের আলোয় পুরো এলাকাটা আলোকিত হয়ে থাকায় তিনি রাইফেলের সাথে টর্চ লাগালেন না। এতে বেশ কিছুটা সময়ও নষ্ট হত। চিতাবাঘটার হাত থেকে কুকুরটাকে বাঁচাতে চাইলে এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করা যাবে না।

কিন্তু বাংলোর মাঠ পার হয়ে তিনি জঙ্গলে পৌছাতেই পরিস্থিতি বদলে গেল। ঘন হয়ে জন্মানো গাছগুলোর পাতা ও ডালপালার ফাঁক গলে চাঁদের আলো নীচে পৌছাতেই পারছে না। অন্ধকারের একটা চাদর যেন তাঁকে ঢেকে ফেলেছে। এন্ডারসন বুঝতে পারলেন এভাবে অন্ধকারে কিছুই না দেখে এগুতে থাকলে হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ ঝোপ-ঝাড় ও লতা-গুল্মে হোঁচট খেয়ে তিনি যে শব্দ করছেন তাতে চিতাবাঘটা ভয় পেয়ে তার শিকার নিয়ে এ এলাকা ছেড়ে চলে যেতে পারে। তা ছাড়া কুকুরটাকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করার

সম্ভাবনাও ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে। কাজেই তিনি একটা গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে পড়লেন। কেন টর্চটা সঙ্গে আনলেন না এই ভেবে নিজের উপরই তাঁর রাগ হতে লাগল। এতে হয়তোবা কিছুটা সময় নষ্ট হত কিন্তু টর্চটা সঙ্গে থাকলে তিনি অন্তত দেখে এগুতে পারতেন।

এদিকে এন্ডারসনকে তাকে অনুসরণ করতে না দেখে চিতাবাঘটা ধরে নিল তিনি বাংলোর দিকে ফিরে গেছেন। নিশ্চিন্ত মনে দশ মিনিটের মধ্যে সে খাওয়া শুরু করল। এন্ডারসন থেকে চিতাবাঘটার দূরত্ব খুব বেশি না হওয়ায় তিনি একটু পরপরই ওটার হালকা গর্জন ও সেই সাথে মাংস ছেঁড়া ও হাড় চিবানোর শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। এন্ডারসন ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না এখন কী করবেন। চুপিসারে চিতাবাঘটার দিকে এগিয়ে যাবেন, নাকি টর্চ আনতে বাংলোতে ফিরে যাবেন? আর এই দ্বিধার কারণেই তিনি শেষ পর্যন্ত ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলেন।

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে যেতেই এন্ডারসন উঠে দাঁড়ালেন। এবার খুব সাবধানে যেন শব্দ না হয় এমনভাবে পায়ের বুড়ো আঙুলের উপর ভর দিয়ে শব্দ লক্ষ্য করে এগুতে লাগলেন। যতক্ষণ চিতাবাঘটার খাওয়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে ততক্ষণ তিনি এগুচ্ছেন, আবার শব্দ থেমে গেলে এন্ডারসনও থেমে যাচ্ছেন। কারণ কোনওভাবে তিনি যদি কোনও শব্দ করে বসেন তবে চিতাবাঘের মাংস চিবানো ও খাওয়ার শব্দের আড়ালে তা ঢাকা পড়ে যাবে, কিন্তু চিতাবাঘটা খাওয়া বন্ধ করা অবস্থায় তাঁর দিক থেকে করা যে কোনও শব্দ ওটার কানে পৌঁছে যাবে।

অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পা ফেলে এন্ডারসন যখন প্রাণীটার মাত্র পাঁচ গজের মধ্যে চলে আসলেন ঠিক তখনই দুর্ঘটনাটা ঘটল। সেই সাথে তিনজন নিরীহ মানুষের নিয়তিও নির্ধারিত হয়ে গেল। একটা ভাল্লুক কিংবা শূকর মাটিতে একটা গর্ত খুঁড়েছিল। অন্ধকারে দেখতে না পেয়ে এন্ডারসন গর্তটাতে পা দিয়ে ফেললেন ও হোঁচট খেয়ে সামনে পড়ে গেলেন। সাথে সাথে চিতাবাঘটা তাঁর উপস্থিতি টের পেয়ে গেল, এক গর্জন করে উঠে ঘন জঙ্গলের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

গর্ত দেখে উঠে পড়ে সামনে এগুতে এন্ডারসন কুকুরের দেহটা আবিষ্কার করলেন, ঘন অন্ধকারে এটাকে একটা হালকা ছোপের মত দেখাচ্ছে। এন্ডারসন বাংলোয় ফিরে এসে দেখলেন কুকুরের খোঁজে আলিমের পরিবারের লোকজন বাইরে বের হয়ে এসেছে। তারা এন্ডারসনেরও খোঁজ করছে।

.৪০৫ রাইফেলের ব্যারেলে টর্চটা লাগিয়ে আলিমকে নিয়ে তিনি দ্রুত ঘটনাস্থলে ফিরে আসলেন। চিতাবাঘটা কুকুরটার মাত্র এক চতুর্থাংশ খেতে পেরেছে। আলিম কুকুরের দেহের অবশিষ্টাংশ নিয়ে বাংলোয় ফিরে চলল, অন্যদিকে এন্ডারসন চিতাবাঘটার খোঁজে বের হলেন।

সাথে টর্চ থাকায় তিনি এখন জঙ্গলে সহজেই ঘুরে বেড়াতে পারছেন। পরবর্তী দুই ঘণ্টা তন্নতন্ন করে খুঁজেও চিতাবাঘটার কোনও চিহ্নই খুঁজে পেলেন না। বরং শূকরের পালের ঘোঁত ঘোঁত শব্দ নিশ্চিত করল এটা এলাকা থেকে সরে পড়েছে। রাস্তার অন্য পাশে ও রেলসিগন্যালের পাশের রেললাইনের চারদিকে বেশ কয়েকটা চিত্রা হরিণ ও একটা নীলগাই শান্তিতে চরে বেড়াচ্ছে। সবকিছুই একেবারে শান্ত, কিন্তু হঠাৎ করেই অরণ্যের নীরবতা ভেঙে খানখান হয়ে গেল

তীব্র হুইসেলের শব্দে। একটা মালগাড়ী আসছে।

চিতাবাঘটাকে পাওয়া যাবে না নিশ্চিত হয়ে বাংলোতে ফিরে আসলেন এন্ডারসন। সকালে কুকুরটাকে কবর দেবার সময় মহিলা ও শিশুদের কান্নাকাটি শুনতে পেলেন তিনি। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি তাঁর ক্যাম্প সাইটের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন।

পরের দিন রাতের ট্রেনে এন্ডারসন দিগুডামুট্টা ত্যাগ করলেন। তবে যাবার আগে আলিমকে তাঁর বাঙ্গালোরের ঠিকানা ও দুটি ফেরত খাম ধরিয়ে দিলেন। কোনও সমস্যা দেখা দিলে সে যেন তাঁকে লিখে জানাতে পারে। চিতাবাঘটাকে না মেরেই চলে যেতে হচ্ছে বলে তাঁর মনে কিছুটা আক্ষেপ থাকলেও বাঙ্গালোর পৌঁছার আগেই তিনি পুরো ঘটনাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেললেন।

কিন্তু কাহিনিটি যে এখানেই শেষ হয়ে যায়নি তার প্রমাণ মিলল চার মাস পর আলিমের চিঠিতে। তাতে বলা হয়েছে লং ব্রিজ এবং পানির ট্যাংক ও আউটার সিগন্যালের মাঝখানে একজন শ্রমিক হিংস্র কোনও প্রাণীর হাতে মারা পড়েছে। কোনও প্রাণীর পায়ের ছাপ পাওয়া না গেলেও, শ্রমিকটার অর্ধভুক্ত লাশ দেখে এ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে। চিঠিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে খুনটার জন্য দায়ী কে তা নিয়ে মতবিরোধ আছে। কেউ বলছে কাজটা বাঘের, আবার কেউ বলছে ভাল্লুকের হাতে মারা গেছে। কেউ কেউ তো প্রেতের কারসাজি বলেও দাবি করল। তবে আলিমের স্থির বিশ্বাস, চিতাবাঘটাই লোকটাকে মেরেছে। এন্ডারসনকে দিগুডামুট্টা এসে চিতাবাঘটা মারার অনুরোধ জানিয়ে চিঠিটা শেষ করা হয়েছে।

এন্ডারসন চিঠিটার জবাব দিয়ে আলিমকে জানালেন যেহেতু হত্যাকাণ্ডটা বেশ কিছুদিন আগে সংঘটিত হয়েছে এবং কে এটা ঘটিয়েছে তা নিশ্চিত নয়– তাই তিনি এ মুহূর্তে এখানে আসা জরুরী মনে করছেন না। তবে নতুন কোনও ঘটনা ঘটলে আলিম যেন অবশ্যই তাঁকে লিখে জানান। একমাস পর আলিমের দ্বিতীয় চিঠি আসল। চিঠিতে জানানো হয়েছে পানির ট্যাংকের দায়িত্বে থাকা শ্রমিকটার ডিউটি শেষ হতে হতে সন্ধ্যা হয়ে যেত। সে এবং অন্য একজন শ্রমিক, যার কাজ হলো ঠিক ছয়টার সময় রেলের আউটার সিগন্যালের তেলের বাতিটা জ্বালিয়ে দেয়া, প্রতি দিন সন্ধ্যায় সিগন্যালের নীচে মিলিত হত এবং এক সাথে রেল স্টেশনে ফিরত। প্রত্যেকদিন একই সাথে ফেরবার কারণে তাদের দু'জনের মধ্যে বেশ ভাল বন্ধুত্ব হয়ে গেছে।

কিন্তু চিঠিটা পাঠানোর আগের দিনে স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। এদিন দ্বিতীয় শ্রমিকটি বাতি জ্বালিয়ে লোহার সিগন্যালটার নীচে এসে তার বন্ধুকে দেখতে পেল না, অথচ প্রত্যেকদিন সে এখানেই তার জন্য অপেক্ষা করে। ভাব বন্ধু ঘুমিয়ে পড়েছে মনে করে সে চিৎকার করে তার নাম ধরে ডাকতে আরম্ভ করল– 'রাম! রাম!'

অনেক বার নাম ধরে ডাকার পরেও কোনও জবাব না পেয়ে সে তার বন্ধুকে খুঁজতে শুরু করল এবং পানির ট্যাংকটার নীচে তাকে খুঁজে পেল। লাশটার শুধুমাত্র বুকের কাছে কিছু মাংস খাওয়া হয়েছে। সন্ধ্যা ছয়টা বেজে গেলেও

তখনও কিছুটা আলো ছিল, আর এই আলোতে দ্বিতীয় শ্রমিকটি ট্যাংকের উপচে পড়া পানিতে ভেজা নরম মাটিতে চিতাবাঘের পিছনের পায়ের ছাপ আবিষ্কার করে।

আতংকিত শ্রমিকটা পায়ের জুতা খুলে রেখে দৌড়াতে শুরু করল এবং স্টেশনে না পৌছান পর্যন্ত সে থামল না।

'এখনই চলে আসুন! একটা মানুষখেকো চিতাবাঘ আমাদের মধ্যে আস্তানা গেড়েছে!' জরুরি এই আবেদনের মধ্য দিয়ে আলিম তার চিঠি শেষ করেছে।

সেদিন জরুরি কয়েকটা কাজ থাকায় এন্ডারসন ঠিক করলেন আগামীকাল খুব ভোরে নিজের গাড়ি নিয়ে দিগুভামুট্টায় রওয়ানা হবেন। গাড়ি নেয়ার দুটি কারণ– তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থলে পৌছানো, এবং গাড়িতে করে ক্যাম্প করার উপযোগী সরঞ্জামও নেওয়া যাবে। এবার আর তিনি বাংলোতে থাকার ঝুঁকি নিতে রাজী নন।

সন্ধ্যার দিকে বাড়িতে ফিরে এসে যাওয়ার জন্য গোছগাছ শেষ করে এন্ডারসন সবে খেতে বসেছেন, এসময় তাঁর বাসার বেলটা বেজে উঠল। তাঁর চাকর থাংগাভালু একটা টেলিগ্রাম নিয়ে আসল। টেলিগ্রামটা খুলতেই তিনি একটা ধাক্কা খেলেন। এতে লেখা আছে, 'চিতাবাঘটা বোনের বাচ্চাকে মেরে ফেলেছে। তাড়াতাড়ি আসুন– আলিম।' ভোর হবার আগেই এন্ডারসন বেরিয়ে পড়লেন।

আপনার যদি কখনও দিগুভামুট্টা ফরেস্ট রেস্ট হাউজে ভ্রমণের সুযোগ হয় তবে বাংলোটার দক্ষিণ-পুব কোণে একটা ছোট সমাধি আপনার চোখে পড়বে। সমাধিটার উপরে পাথরের ফলকে কেবল একটা শব্দ খোদাই করা 'মিসচিফ'।

ব্রিটিশ শাসন আমলে এক বিট্রিশ ফরেস্ট অফিসার তাঁর পোষা কুকুর 'মিসচিফকে' নিয়ে দিগুভামুট্টার ফরেস্ট বাংলোতে আসেন। কিন্তু একদিন হঠাৎ করেই একটা চিতাবাঘ মিসচিফকে আক্রমণ করে বসে এবং কুকুরটাকে মুখে নিয়ে পালিয়ে যেতে উদ্যত হয়। এদিকে কুকুরটাকে নিয়ে চিতাবাঘটাকে চলে যেতে দেখে সেই ফরেস্ট অফিসার চিতাবাঘটাকে লক্ষ্য করে গুলি করেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে গুলিতে চিতাবাঘটার সাথে সাথে তাঁর প্রিয় কুকুরটারও মৃত্যু হয়। কুকুরটার মৃত্যুতে প্রচণ্ড আঘাত পাওয়া অফিসার এটার মৃত্যুকে স্মরণীয় করে রাখতে যেখানে এটা মারা পড়েছে সেখানেই এটাকে কবর দেন এবং কবরের উপরে পাথরের ফলকে ওটার নাম লিখে দেন।

এন্ডারসন গাড়ি থেকে নামতেই তাঁর জন্য অপেক্ষারত আলিম তাঁকে পুরো ঘটনাটা খুলে বলল। তার বোনের মেয়ে পিয়েরি মিসচিফের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনাটা জানত এবং কুকুরটার প্রতি ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ প্রত্যেকদিন সকালে সে কবরটার উপর কিছু জণ্ডলী ফুল রেখে যেত। কিন্তু ঘটনার দিন সকালে কোনও কারণে সে সংগ্রহ করা ফুলগুলো সমাধিপাথরের উপর রেখে যেতে ভুলে গিয়েছিল। সন্ধ্যার ঠিক পরে তার মনে পড়ল মিসচিফের জন্য রাখা ফুলগুলো সে রেখে আসতে ভুলে গেছে। চারদিকে ততক্ষণে অন্ধকার নেমে এসেছে। এদিকে ভোরে সংগ্রহ করা ফুলগুলো ইতিমধ্যে শুকিয়ে যাচ্ছে।

পিয়েরি মাকে তার ফুলের কথা জানিয়ে বলল সে এখন ফুলগুলো মিসচিফের সমাধিতে রেখে আসবে। তার মা তাকে এখন বাইরে বের হতে নিষেধ করে বলল

এই অন্ধকারে বাইরে বের হলে মানুষখেকোটা তাকে আক্রমণ করতে পারে। তা ছাড়া ফুলগুলোও শুকিয়ে গেছে। সে বরং আগামীকাল সমাধিতে নতুন ফুল রেখে আসতে পারবে।

কিন্তু মায়ের কথা বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করে পিয়েরি ফুলগুলো তুলে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। সে যে সেখানে পৌঁছাতে পেরেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই কারণ পরে সমাধি পাথরের উপর ফুলগুলো খুঁজে পাওয়া যায়। কোনও ধরনের গোঙানি, চিৎকার কিংবা গর্জনের শব্দও কারও কানে আসেনি। কিন্তু মেয়েটা ফিরে এল না।

মেয়েটাকে ফিরে আসতে না দেখে আলিমের বোন চিন্তিত হয়ে পড়ল। বেশ কিছুক্ষণ জোরে জোরে নাম ধরে ডেকেও যখন তার থেকে কোনও জবাব পাওয়া গেল না তখন আতঙ্কিত হয়ে সে পাশের রুম থেকে আলিম ও তার দুই স্ত্রীকে ডেকে আনল।

লণ্ঠনের আলোয় পথ দেখে দেখে চারজনের দলটা ছোট কবরটার সামনে চলে আসল এবং পাথরের উপর ফুলগুলো খুঁজে পেল কিন্তু মেয়েটার কোনও চিহ্নই খুঁজে পাওয়া গেল না। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করতেই সমাধিটা থেকে কিছুটা দূরে তারা মেয়েটির গলায় যে মালাটা পরা ছিল তার পুঁতিগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখল। এগুলো যে সুতার সাথে বাঁধা ছিল সেটাও পাশেই পড়ে আছে। আরও কিছুটা এগুতেই তারা মাটিতে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ে থাকতে দেখতে পেল। এক মুহূর্ত দেরি না করে আলিম তার সাথের তিন মহিলাকে নিয়ে গ্রামে ফিরে আসল। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ছুরি, লাঠি সহ বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রেঞ্জার, ফরেস্ট গার্ড ও বেশ কয়েকজন গ্রামবাসীকে নিয়ে তারা ঘটনাস্থলে ফিরে আসল। আশপাশের জঙ্গলে বেশ কিছুক্ষণ খুঁজেও তারা মেয়েটাকে পেল না। অবশ্য সাথে বন্দুক কিংবা রাইফেল না থাকায় তারা জঙ্গলের ভিতরে ঢোকবার সাহস পায়নি। পরের দিন সকালে তারা আবার মেয়েটার খোঁজে বের হলো। এবার তারা চিতাবাঘের পায়ের ছাপের পাশাপাশি টেনে বাচ্চাটাকে গভীর জঙ্গলের দিকে নিয়ে যাবার চিহ্নও খুঁজে পেল। এখানে তারা বাচ্চাটার কিছু ছেঁড়া জামা-কাপড়ও পড়ে থাকতে দেখল। কিন্তু এর পর পরই মানুষখেকো এবং মেয়েটার সমস্ত চিহ্ন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

আলিম এন্ডারসনকে রেস্ট হাউজেই থেকে যেতে অনুরোধ করল, কারণ খোলা আকাশের নীচে তাঁবুতে রাত কাটালে তিনি সহজেই মানুষখেকোটার আক্রমণের শিকার হতে পারেন। আলিম তার দুঃসাহসী ও ভয়ঙ্কর পরিকল্পনাটা এন্ডারসনের সামনে প্রকাশ করার আগ পর্যন্ত তিনি রেস্ট হাউজে থাকার প্রস্তাবটা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে গেলেন। তার পরিকল্পনা অনুযায়ী এন্ডারসন যদি বাংলোর বারান্দার পিলারের আড়ালে রাইফেল নিয়ে অপেক্ষা করতে রাজি থাকেন তবে সে টোপ হিসাবে মিসচিফ নাম খোদাই করা পাথর ফলকটার উপর বসতে চায়। সে চিতাবাঘটার উপস্থিতি টের পাবার সাথে সাথেই এন্ডারসনকে সতর্ক করে দেবে এবং তিনি তখন টর্চ জ্বালিয়ে মানুষখেকোটার উপর আলো ফেলে এটাকে গুলি করবেন।

আলিমের পরিকল্পনাটা প্রচণ্ড দুঃসাহসিক হলেও যুক্তির বিচারে একেবারেই অসম্ভব ও হাস্যকর।

অনেক দেরি হয়ে যাবে। কারণ মানুষখেকোটা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত তার পক্ষে এটার উপস্থিতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া অসম্ভব। আর এটা যখন তার উপর এসে পড়বে তখন অনেক দেরী হয়ে যাবে। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যে জিনিসটা তা হলো আলিমের গায়ে গুলি লেগে যাবার ভয়ে এন্ডারসনের পক্ষে তখন মানুষখেকোটাকে গুলি করাও সম্ভব হবে না। এমনকী কোনওভাবে মানুষখেকোটার উপস্থিতি টের পেয়ে এটা আক্রমণের আগেই সে যদি এন্ডারসনকে সতর্ক করে দেয় তবেও কোনও লাভ হবে না। কারণ এক্ষেত্রে ওটা সামনেই আসবে না।

আলিমের এই যেচে আত্মহত্যা করার প্রস্তাব এন্ডারসন সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন। তবে তিনি তাঁর পরিকল্পনাটা পুরোপুরি বাতিল করলেন না, বরং নিজেই ভারতীয় পোশাকে সজ্জিত হয়ে টোপ হিসাবে মিসচিফের কবরের উপর বসবার সিদ্ধান্ত নিলেন। ভারতীয় পোশাক পরবার কারণ তাঁকে তাঁর নিজস্ব পোশাকে দেখলে প্রচণ্ড চতুর ও বুদ্ধিমান প্রাণীটা সতর্ক হয়ে যাবে। এন্ডারসন আলিমকে তাঁর পরিকল্পনার কথা জানালেন। এবার আলিমের প্রতিবাদ করার পালা। তবে তিনি তাঁর নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন।

সূর্যাস্তের আগেই আলিমের সবচেয়ে বাজে ও ময়লা পোশাকটা গায়ে চাপিয়ে তিনি পাথরের উপর বসে পড়লেন। নিজেকে একজন সাধারণ গ্রামবাসী হিসাবে মানুষখেকোটার কাছে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য মুখে ও হাতে বেশ কিছুটা কয়লা মেখে নিয়েছেন। মাথায়ও পাগড়ীর মত পেঁচিয়েছেন একটা কাপড়। রাইফেল ও এর সাথে লাগানো টর্চটা হাতের উপর এমনভাবে রেখেছেন যেন সহজে চোখে না পড়ে। বাড়তি সতর্কতা হিসাবে উপরে কিছু পাতাও ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এন্ডারসন রেস্ট হাউজের দিকে পিছন ফিরে এমনভাবে বসেছেন যেন তিন দিকের জঙ্গলেই তিনি দৃষ্টি রাখতে পারেন।

সূর্যটা আস্তে আস্তে পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ছে। জঙ্গল ও জঙ্গলের প্রাণীরা যাদের মুগ্ধ করে তাদের বিমোহিত হবার এটাই আদর্শ সময়। এসময়ই পাখিরা তাদের সমস্ত সুর ঢেলে দিয়ে গান গাওয়া শুরু করেছে, জঙ্গলের পালাবদলের খেলায় রাতের প্রাণীরা এসময়েই দিনের প্রাণীদের কাছ থেকে অরণ্যের দায়িত্বভার নিজের হাতে তুলে নেয়। অন্ধকারকে স্বাগত জানিয়ে তাদের যে সম্ভাষণ তা যেন পুরো জঙ্গলকে মাতাল করে তোলে।

সূর্যাস্ত ও তার পরের অরণ্যের এই রূপ সবসময়ই এন্ডারসনকে মুগ্ধ করে। কিন্তু এ মুহূর্তে এদিকে তাঁর বিন্দুমাত্র মনোযোগ নেই। তাঁর চোখ, কান ও প্রতিটি স্নায়ু সজাগ হয়ে আছে মানুষখেকোটার প্রতীক্ষায়। এখনই সময় যখন মানুষখেকোটা তৎপর হয়ে ওঠে। এসময়ই সে এখান থেকে পিয়েরিকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল এবং একটা ভাল সম্ভাবনা আছে আবারও একটা সহজ শিকারের প্রত্যাশায় সে এখানে ফিরে আসবে। এ সমস্ত চিন্তাভাবনা এন্ডারসনকে ক্রমেই বিপদের জন্য আরও বেশি সতর্ক করে তুলল।

শীঘ্রই ঘন অন্ধকারের পর্দা পুরো বনানীকে ছেয়ে ফেলল। এন্ডারসনের পিছনের রেস্ট হাউজটা ঘন কালো জঙ্গলের পটভূমিতে অস্পষ্ট একটা কালো দাগের মত দেখাচ্ছে। মৃদু বাতাসে ঈষৎ নড়তে থাকা গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে একটা দুটো তারা উঁকি মারছে। একটু দূরেই আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক বাঁশ বাগান, বাঁশের কঞ্চিগুলো বাতাসের ধাক্কায় একবার মাটিতে নেমে আসছে তো পরের বার আবার আকাশে উঠছে।

ঠিক তখনই এন্ডারসন তাঁর একটু বাম দিকে একটা মৃদু শব্দ শুনলেন। তারপর আবার শব্দটা শোনা গেল। কয়েক ফুট দূরের ঘন ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর থেকে শব্দ সৃষ্টিকারী প্রাণীটা যেন আস্তে আস্তে এদিকেই এগিয়ে আসছে। তিনি একদৃষ্টিতে সামনের ঘন ঝোপটার দিকে তাকালেন, কিন্তু গাঢ় অন্ধকারের একটা দেয়াল ছাড়া কিছুই দেখতে পেলেন না। এন্ডারসন লোডেড রাইফেলটা হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরলেন এবং আস্তে আস্তে খুব সতর্কতার সাথে রাইফেলের বাঁটটা কাঁধে তুলে নিয়ে বাম হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে টর্চের সুইচটা টিপে দিলেন। উজ্জ্বল একটা আলোক রশ্মি অন্ধকার ভেদ করে খুদে একটা প্রাণীর উপর পড়ল। একটা কালো কাঁকড়াবিছা। ভারতে বিশেষ করে অন্ধ্রপ্রদেশে এ প্রাণীটা প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

আলো পড়তেই কাঁকড়াবিছাটা থেমে গিয়ে হিস হিস শব্দ করতে শুরু করল, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে সে এন্ডারসনের আচরণে বিরক্ত হয়েছে। টর্চের সুইচ বন্ধ করে এন্ডারসন রাইফেলটা আবার তাঁর পায়ের কাছে মাটিতে নামিয়ে রাখলেন।

পুরো ঘটনাটাই এন্ডারসনের জন্য হতাশাজনক। কারণ কাঁকড়াবিছাটার দিকে টর্চ জ্বেলে তিনি নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করে দিয়েছেন। মানুষখেকোটা যদি আশপাশে কোথাও থেকে থাকে তবে সেটা নিঃসন্দেহে টর্চের আলো দেখেছে। আর মানুষখেকোর বিপদ উপলব্ধির স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বসে সেটা তার বিপদ টের পেয়ে যাবে এবং এ এলাকা ছেড়ে চলে যাবে।

টর্চটা নিভিয়ে দেবার একটু পরেই এন্ডারসন ইঞ্জিনের হুইসেলের শব্দ শুনতে পেলেন। এটা সম্ভবত আউটার সিগন্যালের ঠিক আগের বাঁকটা অতিক্রম করছে। তারপরই ঘর ঘর শব্দ তুলে মালগাড়িটা হঠাৎ থেমে গেল এবং ড্রাইভার আবার হুইসেল দেয়া শুরু করল। একটানা হুইসেলের শব্দে পুরো বন যেন কাঁপতে শুরু করল। হুইসেল থামতেই এন্ডারসন দুটি কণ্ঠ শুনতে পেলেন, ড্রাইভার ও ফায়ারম্যান নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। তারা বেশ জোরে শব্দ করে কথা বলছে এবং তাদের খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে।

কী ঘটতে পারে চিন্তা করছেন এন্ডারসন এবং একটু পরই তিনি সমাধানে পৌঁছে গেলেন। আউটার সিগন্যাল মালগাড়িটাকে স্টেশনে ঢোকবার সংকেত দিচ্ছে না কারণ নানদিয়ালগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা বিপরীত দিক থেকে আসছে। অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটা বারোটা ছুঁয়ে ফেলেছে; সময় এন্ডারসনের ধারণা থেকে দ্রুত এগুচ্ছে।

একটু পরই বেশ কিছুটা দূর থেকে প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ইঞ্জিনের শব্দ ভেসে আসল এবং তারপরই তিনি স্টেশনে ট্রেনটা থামার শব্দ পেলেন। মালগাড়িটা

হুইসেল বাজিয়ে আস্তে আস্তে চলতে শুরু করল। কিছু সময় প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা দ্রুত গতিতে নানদিয়াল অভিমুখে যাত্রা করল।

এন্ডারসন আশা করেছিলেন সব কিছু আবার শান্ত হয়ে আসবে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তিনি আবার লোকজনের কথাবার্তার শব্দ শুনতে পেলেন। একটু পরই লণ্ঠন হাতে কয়েকজন লোককে রেস্ট হাউজের গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে দেখলেন। বিরক্ত হয়ে এন্ডারসন পাথরটার উপর থেকে উঠে পড়লেন, এত কিছুর পর মানুষখেকোটা কোনও অবস্থাতেই আজ আর এ এলাকার পথ মাড়াবে না। বাংলোর বারান্দায় আসতেই আলিমের দেখা পেলেন, সেও লোকজনের কথা শুনে বেরিয়ে এসেছে। স্টেশন মাস্টার, রেঞ্জার, মালগাড়ির ড্রাইভার, গার্ড ও একজন ফায়ারম্যানকে নিয়ে তৈরি হওয়া ছোট্ট দলটা ইতিমধ্যে বাংলোর সামনে পৌঁছে গেছে।

তাদের কাছ থেকে এন্ডারসন জানতে পারলেন মালগাড়িটা বড় সুড়ঙ্গ থেকে বের হয়ে আসতেই হেডলাইটের আলোয় ড্রাইভার ও অন্যরা রেললাইনের পাশে লাশের মত কিছু একটা দুমড়ে মুচড়ে পড়ে থাকতে দেখে। ভালভাবে জিনিসটা পরীক্ষা করে ট্রেনের ড্রাইভার ধারণা করে আগের কোনও একটা ট্রেন রেললাইন পার হওয়ার সময় লোকটাকে ধাক্কা দিয়েছে। যেহেতু মালগাড়িটা এসময় খুব কম গতিতে চলছিল–ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখার সিদ্ধান্ত নেয়। ড্রাইভার ও ফায়ারম্যান ট্রেন থেকে নেমে মৃতদেহটার কাছে চলে আসে এবং আতঙ্কিত হয়ে দেখে লোকটাকে ট্রেন চাপা দেয়নি, কোনও একটা প্রাণী তাকে মেরে কিছুটা অংশ খেয়ে চলে গিয়েছে। লোকটার কিছু চিবানো হাড়ও তারা আশপাশে পড়ে থাকতে দেখে। ইতিমধ্যে ট্রেনের গার্ডও নীচে নেমে আসে। লোকটার শুধু কোমরে জড়ানো এক প্রস্থ কাপড় দেখে সে মত প্রকাশ করে লাশটা সম্ভবত চেনচু উপজাতির কোনও লোকের। মানুষখেকো চিতাবাঘটার কথা আগে থেকে জানা থাকায় ড্রাইভার ও তার সঙ্গীরা বিষয়টি দিণ্ডভামুট্টার স্টেশন মাস্টারকে জানানোর সিদ্ধান্ত নেয়। তিনি পরবর্তীতে প্রয়োজন মত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি টেলিগ্রামের মাধ্যমে জানাতে পারবেন। এদিকে দিণ্ডভামুট্টার স্টেশন মাস্টার এন্ডারসনের এখানে অবস্থানের কথাটা আগে থেকেই জানতেন। কাজেই তাঁর কানে খবরটা পৌঁছার পর টেলিগ্রাম করার আগেই রেঞ্জার সহ এন্ডারসনকে খবরটা জানাতে ছুটে আসেন।

চেনচু উপজাতি লোকটার মৃত্যু প্রমাণ করে এন্ডারসনের অনুমান সত্য। এটি নিঃসন্দেহে তখন এখান থেকে অনেক দূরে ছিল। হয়তো বা এটা আজ রাতে বাংলোর আশপাশে আসেইনি। কিংবা কাকড়াবিছাটা যখন তাঁকে বোকা বানায় তখনই এটা এসেছে। সম্ভবত এন্ডারসনের টর্চের আলো দেখে সে এলাকা ছেড়ে চলে যায় এবং সুড়ঙ্গের কাছে চেনচু উপজাতির লোকটাকে পেয়ে মেরে ফেলে। তবে এন্ডারসন যেখানে বসেছিলেন সেখান থেকে সুড়ঙ্গের দূরত্ব বিবেচনা করলে এটা ঘটার সম্ভাবনা কম।

স্টেশন মাস্টার ও অন্যদের তাঁকে খবরটা দেবার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে এন্ডারসন জানালেন তাঁর পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব ততটুকু তিনি করবেন। তারা

বিদায় নিতে আলিমকে তাঁকে ভোর চারটার দিকে ডেকে দিতে বলে তিনি ঘুমাতে গেলেন।

আলিম সম্ভবত আর ঘুমায়নি, কারণ সে সময়মতই তাঁকে ডেকে দিল। তাড়াতাড়ি চা ও কয়েকটা বিস্কুট মুখে পুরে তারা বেরিয়ে পড়ল এবং অন্ধকারের মধ্যে রেললাইন ধরে একজনের পিছনে একজন এগুতে লাগলেন। মানুষখেকো বাঘের এলাকায় এভাবে একজনের পিছনে একজন পথ চলা খুবই বিপজ্জনক, কারণ এসব ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময়ই বাঘ পিছনের লোকটাকে তুলে নিয়ে যায়, এমনকী কোনও কোনও সময় সামনের জন টের পর্যন্ত পায় না পিছনের জন আক্রান্ত হয়েছে। তবে মানুষখেকোটা চিতাবাঘ হলে এভাবে চলা কিছুটা কম ঝুঁকিপূর্ণ: বাঘের তুলনায় ভীতু ও চতুর স্বভাবের চিতাবাঘ আক্রমণের আগেই নিশ্চিত হয়ে নেয় শিকার একা এবং কারও থেকে সাহায্য পাবে না। একজনের বেশি মানুষ থাকলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সে নিজেকে প্রকাশই করবে না।

তাঁরা যখন লম্বা ব্রিজটার কাছে পৌঁছলেন তখন দিগন্তে কেবল আলোর রেখা দেখা দিতে শুরু করেছে। চারদিক আরেকটু ফর্সা হওয়ার জন্য এন্ডারসনদের আরও মিনিট দশেক অপেক্ষা করতে হলো, কারণ এই অল্প আলোয় রেললাইনের স্লিপারের উপরে পা ফেলে ফেলে ব্রিজ পার হওয়া খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ব্রিজ অতিক্রম করার সময় স্লিপারের ফাঁক দিয়ে নীচের উপত্যকা ও নীচের গাছের সারির ক্ষীণ আভাস পাওয়া যাচ্ছে, যদিও তাঁরা এদের দিকে দৃষ্টি দেয়ার সাহস করছেন না। এন্ডারসনের মনে হচ্ছে তাঁরা যেন কখনোই ব্রিজটার শেষ মাথায় পৌঁছতে পারবেন না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনও রকম দুর্ঘটনা ছাড়াই তাঁরা ব্রিজটা পার হতে সক্ষম হলেন। একটু সামনেই মুখ হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে সুড়ঙ্গের অন্ধকার প্রবেশ মুখটা সুড়ঙ্গের প্রবেশ দ্বারের ঠিক আগে এন্ডারসনদের বাম দিকে রেললাইনের পাশে চেনচু উপজাতী লোকটার আধ খাওয়া লাশটা পড়ে আছে।

মৃতদেহ পরীক্ষা করেই তিনি বুঝতে পারলেন মালগাড়ি চলে যাবার পর মানুষখেকোটা আবার এখানে ফিরে এসেছে, রাতের সংবাদদাতারা মৃতদেহের সামান্য অংশই বাঘটা খেয়েছে বলে জানালেও এর অনেক অংশই ইতিমধ্যে খাওয়া হয়ে গেছে। এটার মাথা, হাড় ও পা মূল শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চারপাশে ছড়িয়ে আছে। মড়ির বেশ কিছু অংশ খাওয়া হয়ে যাবার পরও এন্ডারসন আশা করছেন–বাঘটা হয়তোবা আবারও ফিরে আসতে পারে।

দূরবর্তী একটা শব্দে তার চিন্তাধারা বাধাগ্রস্ত হলো। সুড়ঙ্গ মুখে উদয় হওয়া দানবটা যতই এগিয়ে আসছে শব্দটা তত বাড়ছে, একসময় এটা বিরতিহীন গর্জনে রূপ নিল। সকালের প্যাসেঞ্জার ট্রেন দিগুভামুট্টার দিকে যাচ্ছে। ট্রেনটাকে দেখে এন্ডারসনের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। আলিমকে অনুসরণ করতে বলে তিনি দ্রুত সুড়ঙ্গ থেকে উপরের দিকে উঠে যাওয়া রেললাইন ধরে বেশ কিছুটা উঠে আসলেন এবং রেললাইনের উপর দাঁড়িয়ে ড্রাইভারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য দুই হাত উপরে তুলে পাগলের মত নাড়তে লাগলেন।

দ্রুত গতিতে এগুতে থাকা ট্রেনটার ড্রাইভার যখন এন্ডারসনকে দেখতে পেল তখন এটা তাঁর বেশ কাছে চলে এসেছে। একই সময়ে এন্ডারসনও লাফ দিয়ে

ট্রেনের চলার পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন, ড্রাইভারও ব্রেক কষল। অতিরিক্ত গতির কারণে কিছুটা সামনে গিয়ে ওটা দাঁড়িয়ে গেল। ট্রেনের দুই পাশ থেকে দৌড়ে আসা ড্রাইভার ও গার্ডকে পুরো বিষয়টা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে তিনি অনুরোধ করলেন তাঁরা যেন তাঁদের সঙ্গে আলিমকে নিয়ে যায় এবং দিগুভামুট্টার স্টেশন মাস্টারের মাধ্যমে রেঞ্জারকে জানায় তিনি যেন স্থানীয় পুলিশকে দিয়ে আজ রাতে লংব্রিজ ও সুড়ঙ্গের আশপাশে মানুষের চলাফেরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। তিনি মানুষখেকোটার আগমনের প্রতীক্ষা করছেন। এন্ডারসন দ্রুত আলিমকে কিছু নির্দেশ দিলেন। তাদের দু'জনের জন্য চা, খাবার ও কম্বল নিয়ে সে দুইটার দিকে দিগুভামুট্টা থেকে আসা প্যাসেঞ্জার ট্রেনে এখানে ফিরে আসবে।

ইতিমধ্যে কী ঘটেছে দেখার জন্য বেশ কিছু সংখ্যক যাত্রী ভিড় জমানো শুরু করেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার লাশটা দেখতে গোঁ ধরল। যা হোক, তাদের প্রত্যাশা মিটিয়ে মিনিট পনেরো পরে ড্রাইভার ট্রেনটা ছাড়তে পারল।

অবিশ্বাস্য রকম কম সময়ের মধ্যে শকুনের দল মড়িটা আবিষ্কার করে ফেলল। প্রথমে আকাশে ছোট একটা বিন্দু দেখা গেল, তারপর আরও অনেকগুলো। বাতাসে পাখার প্রচণ্ড শব্দ তুলে ঘুরতে ঘুরতে মড়িটা থেকে কিছুটা দূরে মাটিতে নেমে আসল এগুলো। তারপর তাদের স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে আস্তে ধীরে হেলে দুলে মড়িটার দিকে এগুতে আরম্ভ করল।

সুড়ঙ্গের মুখে উপুড় হয়ে বসে থাকা এন্ডারসন রেললাইন থেকে একটার পর একটা পাথর তুলে নিয়ে শকুনগুলোর দিকে ছুঁড়লেন। কারণ এগুলো কিছুক্ষণ এখানে থাকলে মড়ির আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। শকুনগুলোর দূরত্ব বেশি না হওয়ায় তিনি বেশ কিছু পাথর ওগুলোর গায়ে লাগাতে সক্ষম হলেন। এভাবে বেশ কিছুটা সময় অতিক্রান্ত হবার পর এন্ডারসন দিগুভামুট্টাগামী একটা ট্রেনের শব্দ শুনতে পেলেন। একটু পরেই ট্রেনটা দ্রুত গতিতে সুড়ঙ্গ অতিক্রম করে চলে গেল– ট্রেনটার ড্রাইভার সুড়ঙ্গ মুখের এক পাশে গুটিসুটি মেরে বসে থাকা এন্ডারসন কিংবা চেনচুর লাশ কোনটাকেই দেখতে পায়নি। যদিও রেললাইনের পাশে বসে থাকা শকুনের দল তাঁর নজর এড়ায়নি।

বেলা দুটোর একটু পর ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা আসল। ড্রাইভার আলিমকে নামানোর জন্য ট্রেন থামিয়ে ফায়ারম্যান ও গার্ডসহ নিজেও ট্রেন থেকে নেমে আসল। মড়িটা দেখতে আগ্রহী কিছু যাত্রীও তাদের সাথে সাথে নেমেছে। মড়িটা ইতিমধ্যে দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করেছে।

এন্ডারসনদের বিদায় জানিয়ে ঘর ঘর শব্দ তুলে ট্রেনটা চলে গেল। একটু পরই একটা মালগাড়ি এটাকে অনুসরণ করল, তারপরই সবকিছু একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। শকুনগুলোও ইতিমধ্যে ভোজের আশা ত্যাগ করে তাদের রাতের পরিকল্পনা সাজানোর সুযোগ দিয়ে উড়াল দিয়েছে।

এলাকাটা ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে এন্ডারসনের মনে হলো হয় তারা সুড়ঙ্গ মুখেই মানুষখেকোটার জন্য লুকিয়ে থাকতে পারেন, অথবা গেছে সুড়ঙ্গের প্রবেশ পথের উপরে কোনও স্থানে অবস্থান নিতে পারেন। জায়গা দুটির মধ্যে কোনটি মানুষখেকোটার জন্য খুঁজে বের করা কঠিন হবে তার বুঝতে এন্ডারসন নিজেকে

মানুষখেকোর জায়গায় কল্পনা করলেন। এ এলাকায় দীর্ঘদিন থাকার ফলে এবং সহজাত সতর্কতাবশে কিছুক্ষণ পর পর সুড়ঙ্গমুখে উদয় হওয়া ট্রেনগুলোও এদের বিকট গর্জনের সাথে সে নিঃসন্দেহে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। আর তাই নিজেকে প্রকাশের আগে সে অবশ্যই সুড়ঙ্গ মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। আর এভাবে বেশ কিছু সময় ধরে পর্যবেক্ষণের ফলে সুড়ঙ্গ মুখে অপেক্ষা করতে থাকা এন্ডারসনদের দেখে ফেলার সম্ভাবনা প্রবল।

কাজেই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁরা সুড়ঙ্গ মুখের যতটা সম্ভব কাছে পাহাড়ের ঢালে মানুষখেকোটার জন্য অপেক্ষা করবেন। এন্ডারসন আশা করছেন চিতাবাঘটা স্বাভাবিক নিয়ম মেনে উপরের দিকে শত্রুর উপস্থিতি আশা করবে না। প্রবেশ মুখের উপরের মাটি ধারাবাহিকভাবে উপরের দিকে উঠে গেছে। ঘাস, বুনো লতা-পাতা এবং ছোট ছোট গাছপালায় ঠাসা জায়গাটা। চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে ফুটবল থেকে আরম্ভ করে মানুষ সমান উচ্চতার অসংখ্য পাথর।

প্রকৃতিগতভাবে পাওয়া সুবিধাটা কাজে লাগিয়ে তারা একটার পর একটা পাথর সাজিয়ে সুড়ঙ্গের প্রবেশ দ্বার থেকে কিছুটা উপরে তাঁদের আড়াল করার মত উঁচু একটা দেয়াল তুলে ফেললেন। পাথরের এই দেয়ালের মধ্যে এন্ডারসন ও আলিমের জন্য দুটি ফুটোর ব্যবস্থাও করা হলো। ফুটোর ভিতর দিয়ে রেললাইনের পাশে পড়ে থাকা মড়ি এবং এর আশপাশের কিছুটা জায়গা দেখা যায়। আরেকটু বেশি জায়গা দৃষ্টিসীমানায় আনবার জন্য এবং গুলি করার জন্য এন্ডারসনকে অবশ্যই তাঁদের তৈরি অস্থায়ী দেয়ালের উপর দিয়ে তাকাতে হবে। কারণ গর্তের ভিতর দিয়ে গুলি করতে হলে রাইফেলের ব্যারেলের সাথে পাথরের ঘর্ষণে যে শব্দ হবে তা চিতাবাঘটার কানে চলে যাবে, যা ওটার কাছে তাঁদের অবস্থান পরিষ্কার করে দেবে। তাঁদের এই লুকানোর জায়গাটার একটাই সমস্যা, তাঁদের ঢালের উপর থেকে নীচের দিকে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকতে হবে, অর্থাৎ তাঁদের মাথা নীচের দিকে ও পা উপরের দিকে থাকবে।

বিকেল চারটার দিকে তাঁরা তাঁদের নির্দিষ্ট স্থানে শুয়ে পড়লেন। সূর্য এখনও তাঁদের উপর অবিরাম তাপ ঢেলে যাচ্ছে। নীচের দিক থেকে উঠে আসা তাপে তাঁরা যে কম্বলটার উপর শুয়ে আছেন সেটাও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে এন্ডারসন ঢালের উপর দিকে পা ও নীচের দিকে মাথা দিয়ে শোয়ার অসুবিধাও টের পেতে শুরু করলেন। শরীরের অন্য অংশের তুলনায় মাথায় ও বুকে অতিরিক্ত রক্ত জমা হতে থাকায় তিনি অস্বস্তি বোধ করছেন, সূর্যাস্তের সময় সমস্যাটা আরও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠল। প্রচণ্ড অস্বস্তির কারণে তিনি দেহ মোচড়াতে আরম্ভ করলেন, আলিমের দিকে তাকাতেই দেখলেন তার অবস্থাও খুব একটা ভাল নয়। এন্ডারসন পরিষ্কার বুঝতে পারছেন আর বেশিক্ষণ তাঁরা এভাবে থাকতে পারবেন না, শীঘ্রই তাঁদের জায়গা বদল করতে হবে।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, তবে তাঁরা এখনও মৃতদেহটা সনাক্ত করতে পারছেন না। ঠিক এসময় তাঁদের পিছনে পাহাড়ের উপর থেকে একটা কাকর ডেকে উঠল! খার! তারপর সে আবার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাকতে শুরু করল! খার! খার! খার!

এটা কর্কশ কণ্ঠে ডাকতেই থাকল, তবে স্থান পরিবর্তন করল না। অর্থাৎ যে প্রাণীটাকে দেখে এটা সতর্ক সংকেত দিয়ে চলেছে, সেটা এখনও বেশ কিছুটা দূরে আছে। জোরে ডেকে উঠে একটা ময়ূর তাঁদের পিছনের একটা গাছ থেকে উড়ে গেল, এন্ডারসন তাঁর চোখের কোণ দিয়ে ওটাকে নীচের উপত্যকায় যেতে দেখলেন। চারদিক হঠাৎ করেই নীরব হয়ে গেল এবং এরপরই পিছনের পাহাড়ে নিজের নিরাপদ আশ্রয় থেকে একটা বনমোরগ ভয়ার্ত কণ্ঠে ডাকতে শুরু করল কক! কক! কক! কক! তার পিছনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো এন্ডারসনকে নিশ্চিত সন্তুষ্ট করতে পারল না। নিশ্চিত ভাবেই তাঁদের জন্য বিপজ্জনক কোনও কিছুর অস্তিত্ব টের পেয়েই এ প্রাণীগুলো সতর্ক সংকেত দিতে শুরু করেছে। আর বিপজ্জনক প্রাণীটি নিঃসন্দেহে এন্ডারসনদের পিছন থেকেই আসছে। এটা যে কোনও বাঘ কিংবা চিতাবাঘ হতে পারে– তবে এটা মানুষখেকো হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

পরবর্তী কয়েক মিনিটের মধ্যে চারদিক পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেল। এন্ডারসন এখন আর মড়িটাকে দেখতে পাচ্ছেন না, তবে মড়িটার পাশের রেললাইনের পাথরগুলোকে দেখাচ্ছে হালকা একটা ধূসর ফিতার মত। মড়িটাকে সনাক্ত করার জন্য একদৃষ্টিতে ওটার দিকে তাকিয়ে আছেন, ঠিক এসময় পিছনে একটা পাথর গড়িয়ে পড়ার মৃদু শব্দ শুনতে পেলেন এন্ডারসন। শব্দটা এত ক্ষীণ যে সাধারণ কোনও মানুষের পক্ষে বোঝা রীতিমত অসম্ভব, কিন্তু দীর্ঘদিন জঙ্গলে ঘোরাফেরার অভ্যাসের কারণে তাঁর কানে ঠিকই শব্দটা পৌঁছল। মড়ির দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বেশ কিছুটা কসরত করে মাথাটা বামদিকে ঘুরিয়ে পেছনে যেদিক থেকে শব্দ হয়েছে সেদিকে তাকানোর চেষ্টা করলেন। আলিমও তাঁর দেখাদেখি পিছন ফিরে শব্দের উৎসটা সনাক্ত করার চেষ্টা করছে, এন্ডারসনের মনে হলো হয়তোবা মানুষখেকোটা রেললাইন অতিক্রম করতে গিয়ে একটা পাথর নড়িয়ে ফেলেছে, হয়তোবা ওটা সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে এসে মড়ির দিকে যাবার সময় এটার পা লেগে প্রবেশ পথের একটা পাথর স্থান পরিবর্তন করেছে। কী সৌভাগ্য, তাঁরা সুড়ঙ্গের মুখে বসবার সিদ্ধান্ত নেননি?

তিনি যখন এসব ভেবে নিজেকে বাহবা দিচ্ছেন ঠিক তখনই তাঁর মাথায় একটা ভয়ঙ্কর চিন্তা খেলে গেল–সম্ভবত মানুষখেকোটা তাঁদের নীচে নেই। হয়তোবা এটা পিছনের পাহাড়ের উপর থেকে তাঁদের দেখে ফেলেছে, এটা এখন আস্তে আস্তে গুটিসুটি মেরে চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য পিছন থেকে তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে।

এন্ডারসনকে তাঁর চিন্তাভাবনা মাঝপথে থামিয়ে দিতে হলো, কারণ তাঁদের নীচের মাটি থর থর করে কাঁপতে শুরু করেছে, গভীর একটা ঘর ঘর শব্দ ক্রমেই বিরতিহীন গর্জনে রূপ নিল এবং এক মুহূর্ত পরেই আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছুটিয়ে কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে একটা ইঞ্জিন সুড়ঙ্গ মুখ থেকে বের হয়ে আসল। যেহেতু ইঞ্জিনটা উল্টো দিক থেকে চলছে তাই ড্রাইভার এটার হেডলাইট জ্বালাননি, ফলে তাঁরা এটা আসার কোনও সংকেত পাননি। কালো রঙের ইঞ্জিনটা অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হবার সাথে সাথে সবকিছু আবার আগের মতই চুপচাপ হয়ে গেল। আর চিতাবাঘটা তখনই আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিল। এবং ওটা আসল তাঁদের

পিছন থেকে, নীচ থেকে নয়। সম্ভবত মানুষখেকোটা কেবলমাত্র তাঁদের একজনকে দেখেছে, ফলে তার পক্ষে বোঝা সম্ভব হয়নি এখানে আসলে দুইজন মানুষ আছে। সাধারণ চিতাবাঘ যেখানে 'হুক' শব্দে উপস্থিতি জানান দিয়ে কর্কশকণ্ঠে জোরে কেশে উঠে আক্রমণ করে, সেখানে মানুষখেকোটা একটা চক্কর দিয়ে ঘুরপথে নিঃশব্দে তাঁদের দিকে ধেয়ে আসল।

তাঁরা শুধুমাত্র তাঁদের দিকে এগিয়ে আসা মানুষখেকোটার নরম প্যাডের সাথে কর্কশ মাটির ঘর্ষণে সৃষ্টি হওয়া চাপা একটা শব্দ শুনলেন। শব্দটা এত মৃদু যে তাঁরা রীতিমত ধাঁধায় পড়ে গেলেন। মানুষখেকোটা তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল এবং তখনই আবিষ্কার করল একজনকে নয়, সে দু'জন লোককে আক্রমণ করছে। এন্ডারসনদের কাছ থেকে মাত্র দুই গজ দূরে এসে এটা থেমে গেল এবং হতবুদ্ধি হয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে গর্জন করতে শুরু করল এবং ঠিক সে মুহূর্তে তাঁরা বুঝতে পারলেন মানুষখেকোটা আসলেই পৌঁছে গেছে।

তারপরের ঘটনাগুলো বেশ দ্রুত ঘটতে আরম্ভ করল। আলিম লাফিয়ে উঠে চিৎকার করা শুরু করল। এদিকে সহজাত প্রবৃত্তির বশে বিপদ টের পাওয়ার সাথে সাথে এখান থেকে সরে পড়বার জন্য এন্ডারসন পাগলের মত গড়াতে শুরু করলেন। তবে এই অবস্থাতেই তিনি টর্চের সুইচ টিপে দিলেন এবং পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে সরাসরি মানুষখেকোটার মুখে গুলি করলেন। ওটা এন্ডারসনের গুলি খেয়ে লাফ দিয়ে সামনে এগুলো এবং এন্ডারসন ও আলিমের মাঝখান দিয়ে উড়ে গিয়ে নীচের রেললাইনের উপর পড়ল। সেখানেই ওটা স্থির হয়ে পড়ে থাকল।

কিছু সময় পর মধ্যরাতের ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ড্রাইভার ইঞ্জিনের হেডলাইটের আলোয় একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল। দু'জন লোক বসে বসে চা খাচ্ছে, তাদের মাঝখানে একটা চিতাবাঘ মরে পড়ে আছে। আর একটু দূরেই একটা মানুষের দেহের অবশিষ্টাংশ ও কিছু হাড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। এন্ডারসন বাজি ধরে বলতে পারেন এই ড্রাইভার চাকরি থেকে অবসরের বহুদিন পরও এই দৃশ্যটা স্মরণ করবে। ট্রেনের ড্রাইভার যে একজন চমৎকার মানুষ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, তিনি এন্ডারসন ও আলিমকে তাঁদের শিকার করা চিতাবাঘসহ দিগুভামুট্টা পৌঁছে দিলেন।

বেলানদারের বিভীষিকা

একটা পাহাড়ের কাঁধের উপর দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট গ্রামটা। নাম বেলানদার। একটু বড় আর পরিচিত গ্রাম ট্যাগার্থি থেকে এর দূরত্ব তিন মাইল। দুটি গ্রামেরই অবস্থান মহীশূর রাজ্যের শিমোগা জেলায়। কয়েক শতাব্দী হলো মহীশূর রাজ্যের এ অংশটা বাঘের আবাসভূমি হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে। এরা সংখ্যায় এত বেশি যে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই তুলনায় কম শক্তিশালী, কিন্তু চতুর চিতাবাঘদের মেরে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে। অথচ অল্প কিছুদিন আগেও চিতাবাঘেরা এই এলাকায় বিপুল বিক্রমে ঘুরে বেড়াত। তখন গ্রামবাসীদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেছে তারা। অত্যন্ত চতুর আর ধূর্ত এই প্রাণীগুলো আকৃতিতে বাঘের তুলনায় ছোট হওয়ায় সহজে নিজেদের লুকিয়ে রাখতে পারত। প্রতিদিন সন্ধ্যা নামার পর পরই এরা গ্রামের পায়ে চলা পথ ও বাড়িগুলোর আশপাশে ঘোরাফেরা শুরু করত তারপর সুযোগ বুঝে গ্রামবাসীদের হাঁস-মুরগী, কুকুর, ছাগল, ভেড়া ও গরু-মোষের বাচ্চা মুখে নিয়ে চম্পট দিত।

আহত না হলে মানুষকে এরা খুব কমই আক্রমণ করত। তবে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে চিতাবাঘ যখন মানুষ মারত তখনও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া ছিল রীতিমত দুঃসাধ্য। কারণ এ এলাকার জলাময় গভীর জঙ্গলের ভিতর খুব সহজেই এরা লুকিয়ে পড়তে পারত।

তবে এন্ডারসনের এই কাহিনি যখন শুরু তখন বেলানদারে বাঘদের রাজত্ব চলছে; আর বেলানদারের অধিবাসীদের মন শাসন করছে ক্ষমতাধর এক ওঝা। গ্রামের লোকেরা বিশ্বাস করে অলৌকিক ক্ষমতা ও জাদুমন্ত্রের অধিকারী এই ওঝা যে-কোনও ধরনের সমস্যা মন্ত্র ও তাবিজের মাধ্যমে সমাধান করে দিতে পারে। বিশেষ করে পছন্দের মানুষকে বশ করা, অপছন্দের কারও থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া, চাকরি লাভ প্রভৃতি বিষয়গুলোতে তার তাবিজের খ্যাতি সবচেয়ে বেশি।

এ ছাড়া তার আরও একটা গুণের জন্য সবাই তাকে সমীহ করে; তা হলো জঙ্গল বন্ধ করে দেবার ক্ষমতা। একবার জঙ্গল বন্ধ করে দেয়ার পর শিকারীদের সমস্ত অভিযানই এখানে ব্যর্থ হয়ে যাবে। হয় বন্যপ্রাণী শিকারীর বন্দুকের সামনেই আসবে না; নতুবা সামনে আসলেও বন্দুক ফুটে গুলি বের হবে না; কিংবা বন্দুক থেকে গুলি বের হলেও তা শিকারের ধারে কাছেও পৌঁছাবে না। এন্ডারসন অবশ্য এর আগেও একবার এ ধরনের চরিত্রের দেখা পেয়েছেন এবং তার কথা তিনি অন্য একটি শিকার কাহিনিতে উল্লেখ করেছেন। এই পেশার অন্যদের মতই বেলানদারের এই পূজারীর মধ্যেও তার খ্যাতির কারণে বেশ অহঙ্কারী ভাব চলে এসেছিল। তবে এই দোষটা বাদ দিলে এন্ডারসনের তাকে বেশ বন্ধুভাবাপন্ন বলেই মনে হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কী, তার এই দুর্বলতাকে তিনি খুব একটা খারাপ চোখে দেখেন না; কারণ মানুষ মাত্রই নিজের প্রশংসা শুনে

অহঙ্কার ও গর্ব অনুভব করে।

এবার তা হলে মূল কাহিনিতে আসা যাক। বেলানদারের রাক্ষস নামে পরিচিত ভয়ঙ্কর আতঙ্ক সৃষ্টিকারী যে বাঘটার গল্প আমরা বলতে যাচ্ছি সেটা কিন্তু তার শিকার জীবন শুরু করেছিল সাধারণ ও স্বাভাবিক একটা বাঘ হিসাবে। সে সময়টায় কোনও মানুষ কিংবা গবাদিপশু এটার দ্বারা আক্রান্ত হবার খবর পাওয়া যায়নি। চিত্রল, সম্বর ও শুয়োর শিকারের দিকেই এটার ঝোঁক ছিল। এসময় মহীশূরের অরণ্যে এসব তৃণভোজী প্রাণী প্রচুর পরিমাণে দেখা যেত। এরপরেই সরকারী ভাবে পশুচারণকে উৎসাহিত করা শুরু হয় এবং উৎকৃষ্ট পশুচারণ ভূমির অভাব না থাকায় অসংখ্য গবাদিপশুর পাল জঙ্গলে নিয়ে আসা হয়। খুব অল্প সময়ের মধ্যে জঙ্গলের সেরা পশুচারণের জায়গাগুলো হঠাৎ করেই উড়ে এসে জুড়ে বসা এসব গবাদিপশুর পালের দখলে চলে যায়, সেই সাথে বনের আদি বাসিন্দা চিতল, সম্বর, বন্যশূকরেরা, যারা এতদিন বেশ উপদ্রবহীন ভাবেই দিন কাটাচ্ছিল, তাদের কঠিন এক বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়।

নতুন এই পরিস্থিতি বেলানদারের সেই বাঘটার জীবন-যাত্রারও কিছুটা পরিবর্তন আনল।

এখন সে বন্যপ্রাণীর পাশাপাশি জঙ্গলে চরতে আসা গবাদিপশু শিকারেও অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। কম পরিশ্রমে খাবারে যদি একটু বৈচিত্র্য আনা যায়, মন্দ কী? কিন্তু দিন যত গড়াতে লাগল গরু-মোষ শিকারের প্রতি তার ঝোঁক তত বাড়তে লাগল, সেই সাথে বন্যপ্রাণীদের মাংসের প্রতি আগ্রহ কমতে কমতে প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে আসল। নির্বিচারে এটা গবাদিপশু মারতে লাগল।

ভারতীয় এসব এলাকার অধিবাসীরা এত বেশি ধৈর্যশীল ও আরামপ্রিয় যে নিজেদের ভাল মন্দের দায়-দায়িত্বের সবটুকু সৃষ্টিকর্তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে। কিন্তু এই শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসীরা পর্যন্ত বাঘটার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ওটার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কথা ভাবতে শুরু করল। শেষ পর্যন্ত তারা বাঘটাকে মারার জন্য ফাঁদ পাতার সিদ্ধান্ত নিল।

বন্যপ্রাণীদের চলাফেরার ফলে তৈরি হওয়া পথের মাঝখানে গভীর, আয়তকার একটা গর্ত খোঁড়া হলো। একত্রে জড়ো করে বাঁধা কতগুলো বাঁশের টুকরো দিয়ে গর্তের মুখটা বন্ধ করে, উপরে গাছের পাতা আর ছোট ডাল-পালা ছড়িয়ে দেয়া হলো। টোপ হিসাবে একটা বাছুরকে গর্তটার পুব প্রান্তের একটা খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা হলো। গর্তটার দু'পাশ ও পিছনের অংশ কাঁটা গাছের জঙ্গল দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দেয়া হলো যেন ফাঁদটা এড়িয়ে বাঘটা কোনওভাবেই টোপের কাছে পৌঁছতে না পারে।

সব কিছু ঠিকঠাক ভাবেই এগুলো, এবং তৃতীয় রাতে এটা ফাঁদে আটকা পড়ল।

পরদিন সকালে তাদের চিরশত্রুকে এক নজর দেখার এবং যন্ত্রণা দিয়ে এটাকে মারার দৃশ্য উপভোগ করার জন্য বেলানদারের অধিকাংশ মানুষ গর্তটার চারপাশে জড়ো হলো। গ্রামে কোনও বন্দুক নেই, এবং এভাবে যন্ত্রণা দিয়ে বাঘটাকে মারার বিষয়টিও কারও মনে রেখাপাত করল না। আরে, এটাই তো

সেই প্রাণী, যেটা তাদের অসংখ্য গবাদিপশুকে মেরে খেয়ে ফেলেছে!

বেলানদারের অধিবাসীদের যে শুধু বন্দুক নেই, তা নয়, তাদের কাছে বর্শাও খুব কম। এন্ডারসন পরে আবিষ্কার করেন মাত্র দু'জন লোকের কাছে বর্শা আছে। এর মধ্যে একটা বেশ ছোট, লম্বায় চার ফুটেরও কম, আগাটা ভোঁতা। এটাকে বর্শা না বলে শাবল বলাই সম্ভবত ঠিক হবে। দ্বিতীয় অস্ত্রটা আসলেই একটা বর্শা। এটা স্থানীয় মন্দিরের সম্পত্তি। আজ থেকে প্রায় ২৫০ বছর আগের কোনও এক যুদ্ধে নাকি বর্শাটা ব্যবহার করা হয়েছে, যদিও বয়সের ভার এবং মাটি থেকে আলুসহ বিভিন্ন জিনিস তুলতে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হওয়ায়, এটা এখন শাবলটার মতই ভোঁতা হয়ে পড়েছে। অস্ত্র দুটি আকৃতিতে এত ছোট যে গর্তের উপর থেকে এগুলো দিয়ে বাঘটাকে খুঁচিয়ে মারা এক কথায় অসম্ভব। যদিও এতে খুব একটা কিছু আসে যায় না, কারণ দুটি অস্ত্রের মালিকই প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী যে তার অস্ত্র মাত্র একবার ছুঁড়েই বন্দী শয়তানটাকে মেরে ফেলা সম্ভব।

কে আগে অস্ত্র ছোঁড়ার সুযোগ পাবে তা নিয়ে তুমুল তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত শাবলের মালিককে প্রথম তার অস্ত্র ছুড়ে মারার সুযোগ দেয়া হলো, যদিও কীসের ভিত্তিতে তার প্রতি এই পক্ষপাতিত্ব দেখানো হয়েছে তা এন্ডারসনের জানা নেই।

বেশ কিছুটা সময় নিয়ে নিশানা করে শাবল মালিক তার অস্ত্রটা সজোরে নিক্ষেপ করল। কিন্তু ছোঁড়ার পরপরই এর ভোঁতা মাথাটা এক পাশে সরে গেল। ফলে শাবলটার মাথার বদলে পাশের অংশ বাঘটার শরীরে আঘাত করল। তেরছা ভাবে শাবলটা বাঘের পাঁজর ও উরুর মাঝখানে পড়ায় ভোঁতা একটা শব্দ শোনা গেল।

প্রাণীটা তার প্রতি এই নিষ্ঠুর আচরণ সহজভাবে মেনে নিতে পারল না। প্রচণ্ড ক্রোধে গর্জন করে উঠে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে ফাঁদের চারপাশে জড়ো হওয়া লোকগুলোর দিকে তাকাল ওটা।

এদিকে গ্রামবাসীদের তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে দ্বিতীয় লোকটা তার বর্শা ছোঁড়ার জন্য প্রস্তুত হলো। তবে তার আগে হতাশ শাবল মালিকের দিকে একবার অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিতে ভুল করল না সে।

তারপরেই ২৫০ বছরের পুরনো বর্শাটা গর্তের ভিতর তার লক্ষ্যের দিকে উড়ে গেল এবং মুহূর্তের মধ্যে ওটার ভোঁতা মাথা বাঘের শরীরের পিছনের অংশে আঘাত করল।

অপ্রত্যাশিত আর প্রবল একটা শক্তির বিস্ফোরণ ঘটিয়ে গর্তের কিনারা লক্ষ্য করে লাফ দিল ওটা। সামনের থাবার সাহায্যে অন্ধের মত উপরের মাটি আঁকড়ে ধরল। এদিকে বাতাসে উন্মত্তের মত লাথি হানতে থাকা তার পিছনের পা দুটোও গর্তের এক পাশের নাগাল পেল। তারপরেই পা দুটোকে লিভারের মত ব্যবহার করে নিজের শরীরটা উপরের দিকে ঠেলে দিল। পর মুহূর্তেই নরক থেকে উঠে আসা ভয়ঙ্কর এক শয়তানের মত গর্তের মুখ দিয়ে বের হয়ে আসল বাইরে।

বাঘটার মুক্তির পথে একমাত্র বাধা সামনে দাঁড়ানো হতবিহ্বল লোকটা; অনা

সবাই অশুভ প্রাণীটাকে গর্ত থেকে বের হয়ে আসতে দেখেই চম্পট দিয়েছে। চারটে পা পিছন দিকে প্রসারিত করে লোকটার মাথার উপর লাফ দিল বাঘ।

এদিকে এতক্ষণে সম্বিত ফিরে পাওয়া লোকটা পালানোর চেষ্টা করল। কিন্তু সে প্রাণীটার পথ থেকে সরে যাওয়ার আগেই লোকটার মাথার খুলির পিছনের অংশের সাথে বাঘের পায়ের ভয়ঙ্কর ধারাল নখগুলোর সংঘর্ষ হলো। আসলে বাঘটা তাকে অতিক্রম করার সময় প্রাণীটার একটু ছোঁয়া পেল মাত্র। বাঘ যে গতি ও শক্তিতে লাফ দিয়েছে তাতে ওটার থাবা যদি ঠিকভাবে লোকটার মাথায় আঘাত করত তবে তার মাথার খুলি একটা ডিমের খোসার মতই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার কথা। এক্ষেত্রে বাঘের নখের মাথাগুলো লোকটার খুলির চামড়া টেনে গলার পিছনে নামিয়ে এনেছে, বাকি কাজটা শেষ করেছে শরীরের ওজন।

লাফ দিয়ে পালিয়ে গেল বাঘ। লোকটা যেখানে পড়েছে সেখানেই পড়ে রইল, তবে সে এখনও বেঁচে আছে। তার মাথার পিছনের পুরো চামড়াটা খুলির হাড় থেকে আলাদা হয়ে মুখের উপর নেমে এসেছে, ফলে তার লম্বা চুলগুলো এখন পিছনের বদলে সামনের দিকে ঝুলে রয়েছে।

তিন দিনের মাথায় লোকটা মারা গেল, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে আশা করেছে তার চামড়াটা আবার স্বস্থানে ফিরে আসবে। এটাই বেলানদারের বাঘের প্রথম শিকার, যদিও ঘটনাটা ঘটেছে দুর্ঘটনাবশত।

নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার পর আরও কৌশলী ও ধূর্ত হয়ে উঠল বাঘটা। বিভিন্ন জায়গায় বেশ কয়েকটা নতুন ফাঁদ পাতা হলেও কোনওটাতেই ওটাকে ধরা গেল না। উপরন্তু এটা এখন গবাদিপশু শিকার করছে পরিষ্কার দিনের আলোয়। বিশেষ করে দুপুরের পর, যখন সারাদিন চরে বেড়ানো আর খাওয়া-দাওয়ার পর পশুর পাল আর রাখালেরা গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ে। যে কয়েকজন রাখাল এসময় জেগে থাকে, কিংবা আক্রান্ত পশুর কান্নার শব্দে জেগে যায়, তারা চিৎকার-চেঁচামেচি করে আর পাথর ছুঁড়ে মেরে তাড়ানোর চেষ্টা করে ওটাকে। কিন্তু রাখালদের এই বাড়াবাড়ি আর কতদিন সহ্য করা যায়। একদিন এক রাখালের উপর লাফিয়ে পড়ে তাকে আঁচড়ে-কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিল বাঘটা। ভাগ্যক্রমে এ যাত্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেও এই ঘটনা রাখালদের জন্য একটা বড় শিক্ষা হয়ে গেল। এখন বাঘটাকে দেখা গেলে কিংবা সাড়া-শব্দ শুনলেই পশুগুলোকে ওটার করুণার উপর ছেড়ে দিয়ে তারা সবাই পালায়।

বেলানদারের পরিস্থিতি ক্রমেই আরও খারাপ হতে লাগল। গরু-মোষের মালিকেরা এখন আর তাদের পশুর পালকে বনে চরতে দিতে সাহস করে না। তারা ঘরেই এদের খাওয়ানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করে, যদিও এতে করে তাদের বেশ মোটা অংকের টাকা খরচ হচ্ছে। এদিকে আগের মত সহজে খাবার জোগাড় করতে না পেরে বাঘটা ক্রমেই ক্ষুধার্ত আর হিংস্র হয়ে উঠল। অচিরেই এটা বেলানদারের পাশের গ্রাম ট্যাগার্থি আর আশপাশের আরও কিছু ছোট জনবসতিতে শিকার শুরু করল। সেই সাথে ভয়ঙ্কর এক গোখাদক হিসাবে এটার খ্যাতি ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

আর এভাবেই মি. জনসন এটার কথা জানতে পারলেন।

রেলওয়ের কর্মকর্তা জনসন এ এলাকায় বদলি হয়ে আসার আগে ভারতের যে সমস্ত এলাকায় কাজ করেছেন সেখানে বাঘ নেই। সেজন্যই বোধহয় বিরাট এলাকা জুড়ে নাম ছড়িয়ে পড়া এই বাঘটাকে শিকার করতে উৎসাহী হয়ে উঠলেন তিনি। কাজেই অফিস থেকে কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে সাত মাইল দূরের গ্রাম বেলানদারের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। সঙ্গে করে রাইফেল নিতে ভুললেন না। কাহিনির এ পর্যায়ে এসে সেই বৃদ্ধ ওঝা তথা বুদ্ধিয়া এন্ডারসনের গল্পে ঢুকে পড়ল।

এলাকায় সাদা মানুষ এসেছে, এবং বাঘের খোঁজ করছে, এ-কথা শুনে সে তার বিশেষ সাজে সজ্জিত হলো। গায়ে চাপিয়েছে জাফরানের লম্বা ঢিলে আলখেল্লা, মাথায় লম্বা পরচুলা, কপালে ছাইয়ের পুরো আস্তরণ। গলায় বিশাল আকৃতির অ্যাম্বরের চেইন আর জপমালা, হাতে তেল চকচকে লম্বা লাঠি। তারপরই সে হাজির হলো জনসনের সামনে। একে একে তার সমস্ত অলৌকিক ক্ষমতার কথা তাকে জানিয়ে ওঝা দাবী করল, সাদা মানুষ বাঘ মারতে চাইলে তার সাহায্য তাঁকে নিতেই হবে।

বুদ্ধিয়া আসলে কিছু টাকা কামিয়ে নেবার ধান্দা করেছে, তবে এক্ষেত্রে টাকা কামানোর চেয়েও বড় যে বিষয়টা কাজ করছে তা হলো গ্রামবাসীকে দেখাতে চায়, এমনকী সাদা মানুষেরও তার সাহায্য প্রয়োজন হয়। কিন্তু তার কথা শুনে জনসন প্রচণ্ড রেগে গেলেন এবং তাকে এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যেতে বললেন।

প্রচণ্ড ক্রোধে ও উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে চলে গেল ওঝা।

অন্যদিকে গ্রামবাসীরা এই ঘটনায় রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে। বুদ্ধিয়াকে তারা কেউই পছন্দ করে না, সে একেবারে ছোটকাল থেকেই নানা কৌশলে তাদের উপর নিপীড়ন চালিয়ে এসেছে। কিন্তু যত যা-ই হোক, সে তাদের নিজেদের ওঝা, তাদেরই একজন। এমন আক্রমণাত্মক ভাষায় কথা বলে জনসন যে শুধু তাকেই অপমান করেছেন তা নয়, পুরো গ্রামবাসীকেই অপমান করেছেন। আর এভাবেই জনসন পুরো গ্রামের শত্রুতে পরিণত হলেন। তিনি যে বাড়িতে উঠেছেন সেখান থেকে তাকে বের করে দিল গ্রামের লোকেরা। বাঘ মারার জন্য টোপ হিসাবে কোনও পশু তাঁর কাছে বিক্রি কিংবা ভাড়া দিতেও তারা রাজি নয়।

এদিকে একগুঁয়ে স্বভাবের লোক জনসন গ্রামবাসীদের অসহযোগিতা সত্ত্বেও বাঘটা মারার সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন। পাশের গ্রাম ট্যাগার্থিতে চলে আসলেন তিনি। বেলানদারের অভিজ্ঞতা স্মরণ করে এখানে লোকদের সাথে খুব ভাল ব্যবহার করলেন এবং দুটো বয়স্ক ষাঁড় কিনলেন। রাখালদের সাহায্যে ষাঁড় দুটিকে তাড়িয়ে বেলানদারের সীমান্তে নিয়ে আসলেন তিনি। তারপর তাদের পরামর্শ নিয়ে বাঘটা ঘন ঘন যাতায়াত করে এমন একটা নালার পাশে টোপ দুটোকে বেঁধে ফেললেন। কিন্তু একবারের জন্যও চিন্তা করলেন না এই রাখালেরা বেলানদারের নয়, ট্যাগার্থির, বাঘের চলাফেরা সম্পর্কে এরা খুব কমই জানে।

পরের দিন সকালে রাখালদের নিয়ে টোপ পরীক্ষা করতে এসে জনসন আবিষ্কার করলেন একটা টোপ অদৃশ্য হয়ে গেছে। তবে এটাকে বাঘে নেয়নি, কারণ নালার পাশের নরম বালু মাটিতে বাঘের কোনও পায়ের ছাপ পড়েনি। তবে

কয়েকটা মানুষের পায়ের ছাপ পাওয়া গেল। এগুলো কি রাখালদের গতদিনের পায়ের ছাপ, নাকি অন্য কারও? জনসন অন্য টোপটাকে যেভাবে রেখে গিয়েছিলেন সে অবস্থাতেই পেলেন।

শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন বেলানদারের লোকেরা তাঁর প্রথম টোপটা চুরি করে নিয়ে গেছে। কাজেই টোপটা ফিরিয়ে আনার সংকল্প নিয়ে গুলিভর্তি রাইফেল হাতে জনসন বেলানদারে হাজির হলেন। কিন্তু গ্রামের লোকেরা এমন ভাব দেখাল যেন তারা কিছুই জানে না। তারা বলল পায়ের ছাপগুলো তার লোকেরা টোপ বাঁধার সময় তৈরি হয়েছে।

দ্বিতীয় টোপটাও চুরি হয়ে যেতে পারে, এই ভয়ে জনসন তাঁর লোক দু'জনকে এটার উপর একটা মাচা বাঁধার নির্দেশ দিলেন। সেদিন বিকালের পরেই মাচায় উঠে বসলেন তিনি। মাচাতে আসন নেয়ার অল্প সময় পরেই একেবারে দিনের আলোতে বাঘটা এখানে হাজির হলো। জনসন সাথে সাথে গুলি করলেন। কিন্তু তাঁর গুলি কেবল সামান্য আহত করল বাঘটাকে। লাফ দিয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা।

পরের পুরো হপ্তাটাই বাঘের খোঁজে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালেন তিনি। কেউ তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসল না, তাঁর দুই সহযোগীও কাজটা অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে মত প্রকাশ করে তাঁকে ছেড়ে চলে গেল। অচেনা জঙ্গলে একা একা চলতে গিয়ে একবার পথ হারালেও পুরো রাতটা জঙ্গলেই কাটাতে বাধ্য হলেন। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে বাঘটাকে না মেরেই তাঁর কর্মস্থলে ফিরে গেলেন জনসন।

এই ঘটনার পর বেশ কয়েক দিন বাঘটাকে আর দেখা গেল না। বেলানদারের লোকেরা ধরে নিল পদে পদে অসহযোগিতা সত্ত্বেও তাদের গবাদিপশুর জন্য মৃত্যুদূত হয়ে দেখা দেওয়া ভয়ঙ্কর প্রাণীটাকে মেরে ফেলেছেন বিদেশী সাহেব ভদ্রলোক।

এদিকে বুদ্ধিয়া আরও বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে উঠল। সে বুঝতে পারছে গ্রামবাসীদের কাছে তার সম্মান ও প্রভাব কমে গেছে; কারণ সে ঘোষণা করেছিল তার সাহায্য ছাড়া বাঘটাকে মারতে পারবেন না সাহেব। কিন্তু কাজটা তিনি করে দেখিয়েছেন, এবং বেলানদারকে ভয়ঙ্কর এক গোখাদকের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

গবাদিপশুগুলো আবার নিয়মিত ভাবে জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হতে লাগল এবং তারপরই অবশ্যম্ভাবী সেই ঘটনাটা ঘটল।

একদিন বিকালে বিশৃঙ্খলভাবে ছোটাছুটি করতে করতে গবাদিপশুর একটা পাল গ্রামে ফিরে আসল, তবে একটা গরু আর উনিশ বছরের রাখালটি বাদে।

রাত হওয়ার আগে পর্যন্ত কেউ বিষয়টি নিয়ে খুব একটা চিন্তিত হলো না। কিন্তু অন্ধকার নেমে আসার পরেও যখন ছেলেটা ফিরল না, তার আত্মীয়স্বজন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। হারানো পশুর মালিকও অস্থির হয়ে উঠেছে।

পরের দিন সকালে অনুসন্ধানকারী দল গরুটাকে মরা অবস্থায় খুঁজে পেল। একটা বিশাল আকৃতির বাঘই যে এটার ঘাড় ভেঙে ফেলেছে, সে সম্পর্কে নিশ্চিত

হওয়া গেল গরুটার আশপাশে পায়ের ছাপ দেখে। একটু পরেই গরুটার কাছ থেকে একশো গজ দূরে ঝোপের ভিতর লুকানো নিখোঁজ তরুণ রাখালের মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গেল।

গরুটার একটুকরো মাংস না খেলেও, ছেলেটার শরীরের অর্ধেকের বেশি অংশ বাঘটা খেয়ে ফেলেছে। এর কয়েক দিন পরেই আবারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। অর্থাৎ একটা খাদক বাঘ আহত হওয়ার পর, বেঁচে থাকার তাগিদে, মানুষখেকোতে পরিণত হলো।

এরপর থেকে বাঘটার হাতে নিয়মিত মারা পড়তে লাগল মানুষ। পরিস্থিতি এতই বিপজ্জনক আকার ধারণ করল যে আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা কুঁড়ে থেকে আর বেরই হতে চায় না। গরু আর মোষগুলোও খোঁয়াড়ে আটকা পড়ল।

এদিকে বেলানদারে শিকারের অভাব দেখা দেওয়ায় মানুষখেকোটা ট্যাগার্থি আর আশপাশের অন্যান্য গ্রামে অভিযান চালিয়ে মানুষ মারতে শুরু করল।

ঠিক এমন পরিস্থিতিতেই ট্যাগার্থির স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাক্তার স্ট্যানলি একটা চিঠি লিখে পুরো ঘটনাটি জানিয়ে এন্ডারসনকে তাঁর সাথে রাক্ষস নামধারী বাঘটাকে মারবার অভিযানে শরিক হবার অনুরোধ জানালেন। এই ডাক্তার এবং সান্তাভেরীর পোস্ট মাস্টার ডিক বার্ড, যার কথা এন্ডারসন আগেও বলেছেন, তরুণ বয়সে একত্রে অনেক বাঘ মেরেছেন। আশ্চর্য ঘটনা হলো ডাক্তার তাঁর সবগুলো বাঘই মেরেছেন একটি .১২ বোরের শটগান দিয়ে।

ডাক্তারের বয়স হয়েছে, এখন তিনি মনে করেন তাঁর অতি বিশ্বস্ত পুরানো শটগানটা বাঘ মারবার জন্য আদর্শ অস্ত্র নয়।

চিঠি পাবার তিন দিন পর তাঁর প্রিয় স্টুডিবেকারটায় চেপে ট্যাগার্থিতে, ডাক্তারের ডিসপেন্সারি-কাম-হাসপাতালে হাজির হলেন এন্ডারসন। প্রচুর চা আর খাবার-দাবার সাবাড় করার পর পাইপ দিয়ে ধোঁয়ার মেঘ ছাড়তে ছাড়তে এন্ডারসন ডিসপেন্সারির সামনের কামরায় বসে ডাক্তারের সাথে গল্পে মেতে উঠলেন। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে নানান গল্প-গুজবের পর তিনি ডাক্তারকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, এখানে তাঁরা একটা উদ্দেশ্য নিয়ে মিলিত হয়েছেন এবং তাঁদের বেলানদার থেকেই কাজ শুরু করতে হবে।

স্টুডিবেকারে চড়েই তাঁরা বেলানদারের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। বেলানদার যাওয়ার রাস্তাটা এমনিতেই ভয়াবহ, তার উপর আবার কয়েক দিন আগের বৃষ্টিতে এটার অবস্থা আরও খারাপ। এন্ডারসনকে রীতিমত যুদ্ধ করে গাড়ি চালাতে হচ্ছে। পিছনে বসে থাকা ডাক্তার বললেন, তাঁদের সম্ভবত হেঁটেই আসা উচিত ছিল। যা হোক, তাঁরা শেষ পর্যন্ত বেলানদার পৌঁছালেন। এখানে এসেই এন্ডারসন জনসন সাহেবের অসহিষ্ণু আচরণের কারণে গ্রামবাসীদের মনে যে তিক্ততা জন্ম নিয়েছে তা দূর করতে সচেষ্ট হলেন। প্রথমেই তিনি নিজের কুঁড়েতে মুখ গোমড়া করে বসে থাকা বুদ্ধিয়াকে ডেকে আনালেন, তাঁকে বললেন, 'প্রথাগত পোশাক পরে আমি যাতে বাঘ শিকারে সফল হই তার জন্যে পূজা দাও। আর যত মন্ত্র জানা আছে, সব পড়ো।'

অনুষ্ঠানের খরচ বাবদ তিনি তাকে দশটা রূপীও দিলেন।

ওঝার হাসি এ-কান থেকে ও-কানে গিয়ে ঠেকল। দেরি না করে সে নিজের বিশেষ পোশাকে সজ্জিত হয়ে অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিস যোগাড় করতে বাজারে ছুটল। তারপর সে একটা কালো মুরগী ও 'আরক' নামের স্থানীয় এক জাতের মদ কেনার জন্য এন্ডারসনের কাছে আরও পাঁচ রূপী চাইল। কালো মুরগীটা রান্না করা হবে, জঙ্গলের আত্মাদের শান্ত করার জন্য এটা খাবে ওঝা। আরকটাও সে পান করবে একই উদ্দেশে। বৃদ্ধ লোকটা ঘোষণা করল, শুধুমাত্র তারপরই মন্ত্র পড়ার উপযোগী হবে সে। যে মন্ত্র মানুষখেকোটার মৃত্যু ডেকে আনবে।

মুরগী ও আরক দিয়ে বুদ্ধিয়া যখন তার ভোজন শেষ করল তখন তার রীতিমত বেসামাল অবস্থা। দেশী মদের নেশায় নিজের পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেই কষ্ট হচ্ছে। লাল চোখ মেলে অর্থহীন একটা হাসি হেসে সে তার ময়লা ঝোলা থেকে গাছের শিকড় দিয়ে তৈরি একটা ব্রেসলেটের মত বস্তু বের করল। এন্ডারসনের রাইফেলটা চেয়ে নিয়ে মাজলের মধ্যে পরিয়ে দিল সেটা। বেশ কয়েকবার বস্তুটা মাজলের উপর থেকে নীচে পর্যন্ত ঘুরিয়ে আনল।

এভাবেই হলো মন্ত্র পড়াসহ সকল আনুষ্ঠানিকতা। সেই সাথে নির্ধারিত হয়ে গেল বাঘের নিয়তিও। এটা এখন এন্ডারসনের রাইফেলের সামনে পড়তে বাধ্য। জঙ্গলের আত্মারাও খুশি, কারণ ওঝার মাধ্যমে তারা ভালমত খেয়েছে ও পান করেছে।

পুরো ঘটনাটায় তাদের বেশ কিছুটা সময় নষ্ট হলেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এর মাধ্যমে বুদ্ধিয়া আবার তার হারানো সম্মান ফিরে পেল; সেই সাথে বেলানদার গ্রামের সম্মানও পুনরুদ্ধার হলো। আর গ্রামবাসীদের কাছে বেলানদারের বাঘের রাক্ষস হিসাবে খ্যাতিরও সমাপ্তি ঘটল। এটা এখন একটা সাধারণ মানুষখেকো বাঘ ছাড়া আর কিছু নয়, যে শিকারীর গুলি খেয়ে মরবার অপেক্ষায় আছে।

তারা যখন টেগারথির উদ্দেশে রওয়ানা হলেন তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। এই অন্ধকারে স্টুডিবেকারে চেপে ভয়ানক এবড়োখেবড়ো রাস্তা ধরে এগোনো তাদের কাছে এক দুঃস্বপ্নের মত মনে হতে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনও ধরনের দুর্ঘটনা ছাড়াই তাঁরা গন্তব্যে পৌঁছালেন।

পরের দিন সকালে তাঁরা স্ট্যানলির সংগ্রহ করা দুটো টোপ বেলানদারের দিকে চলে যাওয়া রাস্তার কাছাকাছি বেঁধে ফেললেন। টোপগুলো এখানে বাঁধার কারণ, বাঘটার শিকারের এলাকা এখন আর শুধু বেলানদারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া শেষে তাঁরা পায়ে হেঁটে বেলানদারের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। এবং সেখানে পৌঁছে প্রায় বিনা পরিশ্রমেই অতিরিক্ত টোপ হিসাবে তিনটি প্রাণী সংগ্রহ করে ফেললেন। গ্রামবাসীদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী বাঘটা প্রায়ই আসা-যাওয়া করে এমন তিনটি জায়গায় টোপগুলো বেঁধে রাখা হলো। এসব করতে করতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। এন্ডারসন আজকের মত মাচাতে বসার সিদ্ধান্ত বাদ দিলেন। কারণ এখন যে কোনও একটা টোপের উপর মাচা বানাতে হলে তাড়াহুড়া করতে হবে। তবে এতে করে মাচা বাঁধার ক্ষেত্রে

এন্ডারসন সাধারণত যে নিয়ম মেনে চলেন, অর্থাৎ আগে মাচা তৈরি, তারপর মাচা থেকে দেখা যায় এমন সুবিধাজনক জায়গায় টোপ বাঁধা, তা অনুসরণ করা যাবে না। তিনি মনে করেন আগে মাচা বাঁধার দুটি সুবিধা। প্রথমত, টোপটা যদি বাঘের হাতে মারা যায় তবে শিকারী পরবর্তীতে মাচার উপর নিজের সুবিধামত জায়গা থেকে মড়ি খেতে আসা বাঘটাকে গুলি করতে পারবেন। দ্বিতীয়ত, মাচা তৈরি করার কোনও শব্দ বাঘটার কানে পৌছাবে না। মড়ির উপর মাচা তৈরি করা হলে শব্দ হবেই।

তাঁরা যখন ট্যাগার্থির দিকে ফিরতি পথ ধরলেন তখন রীতিমত কালিগোলা অন্ধকার। মানুষখেকোটার আক্রমণের আশঙ্কায় চারদিকে টর্চের আলো ফেলে বেশ সাবধানে তাঁরা এগুচ্ছেন। অবশ্য পুরো রাস্তায় বাঘ তো দূরে থাক, মরা ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর খাবার খোঁজায় ব্যস্ত একটা প্যাঙ্গোলিন ছাড়া আর কোনও প্রাণীর দেখা পেলেন না।

সেদিন রাতে পাঁচটা টোপের একটাও বাঘের হাতে মারা পড়ল না। তবে তৃতীয় দিন সকালে একজন লোক দৌড়াতে দৌড়াতে ডাক্তারের ডিসপেন্সারিতে আসল। লোকটা জানাল, তার চাচাত ভাইকে বাঘে ধরে নিয়ে গেছে। সে আর তার ভাই, তাদের স্ত্রী সহ ট্যাগার্থি থেকে বেলানদারের দিকে চলে যাওয়া রাস্তার ধারে দুটো কুঁড়েতে থাকে। সকালের সূর্য যখন প্রায় মধ্য আকাশে উঠে এসেছে, তখন ভাইটা ট্যাগার্থি থেকে বাড়িতে ফিরছিল।

ছোট্ট বসতিটার বাকি তিন সদস্য তাদের কুঁড়ের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতে দূর থেকে তার কাঠামোটাকে এদিকে এগিয়ে আসতে দেখে। তারপরই সে প্রচণ্ড জোরে চিৎকার দিয়ে উঠল এবং তাদের চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লোকটা জানাল, এরপর সে দ্রুত তার কুঠারটা নিয়ে কী হয়েছে দেখার জন্য রওয়ানা হয়। তার ভাইয়ের স্ত্রীও তার সঙ্গী হলো। তাদের মাথায় মানুষখেকোটার চিন্তা একবারের জন্যও আসল না, বরং তারা ধরে নিল জঙ্গলের কোনও আত্মাই তাকে ধরে নিয়ে গেছে।

লোকটা যেখানে অদৃশ্য হয়েছে সেখানে পৌছে পথের উপর বাঘের পায়ের ছাপ দেখে তারা রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। আর সামনে এগুবার সাহস না হওয়ায় তারা ফেরবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ঘুরছে।

এদিকে কিছুটা দূরে, একটা ঝোপের ভিতর, সবে মাত্র লোকটাকে খেতে শুরু করেছে বাঘ। এসময় মেয়েলোকটার কান্নার শব্দ শুনে তার মেজাজটা গেল বিগড়ে। রক্ত হিম করা কণ্ঠে গর্জন ছাড়ল একটা। দেরি না করে লোকটা মহিলাকে নিয়ে কুঁড়ের দিকে দৌড়াতে শুরু করল। সেখানে পৌছে মহিলা দু'জন একটা কুঁড়েতে ঢুকে দরজা আটকে দিল। সংক্ষিপ্ত একটা রাস্তা ধরে ছুটে এসে এন্ডারসন আর ডাক্তারকে খবরটা জানাল লোকটা। হলফ করে বলল, বাঘটা এখনও সেখানে বসেই তার ভাইকে খাচ্ছে। তাঁরা যদি এখনই তার সাথে ঘটনাস্থলে যান, তবে বাঘটাকে মারার একটা সুযোগ পাবেন।

রাইফেল, টর্চ আর গরম কোটটা নিয়ে এন্ডারসন দ্রুত প্রস্তুত হলেন।

স্ট্যানলিও তাঁর .১২ বোরের শটগান আর একটা টর্চ সঙ্গে নিলেন। সে সময় এন্ডারসনের বয়স ছিল কম, ডাক্তারও বুড়ো হয়ে যাননি। কাজেই দ্রুত পা চালিয়ে খুব তাড়াতাড়িই তাঁরা কুঁড়ে দুটোর সামনে পৌঁছে গেলেন।

এন্ডারসনরা বাঘটা কোথায় আছে বুঝে ওঠার আগেই তাঁদের উপস্থিতি টের পেয়ে গেল বাঘ। খাওয়া বন্ধ করে দিল সে। মাংস ছিঁড়বার কিংবা হাড় চিবানোর কোনও শব্দই তাঁরা পাচ্ছেন না।

তাঁরা আর একটু কাছে চলে আসতেই বাঘটা গর্জে উঠল। তার এই আপত্তি প্রকাশের ভাষা ক্রমেই অসহনীয় পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। এটা পরিষ্কার, বাঘটা তাঁদের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিতে চাচ্ছে। তাঁরা যদি এখন ফিরতি পথ ধরেন তবে খুশি মনেই তাঁদের চলে যেতে দেবে সে। আর যদি সামনে এগোন, হয় আক্রমণ করবে সে, নয়তো শেষ মুহূর্তে উৎসাহে ভাটা পড়বে এবং পালিয়ে যাবে।

এক মুহূর্তের জন্য তাঁরা কিছুটা দ্বিধায় ভুগলেন, তারপর স্ট্যানলি ও এন্ডারসন পরস্পরের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকালেন। এন্ডারসন হাত দিয়ে ইশারা করে লোকটাকে চলে যেতে বললেন। তারপর তাঁরা দুজন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগুতে লাগলেন। এন্ডারসন কিংবা স্ট্যানলি কেউই মানুষখেকোটাকে এখনও দেখতে পাননি। একটার পর একটা গর্জন ভেসে আসছে এবং এন্ডারসনদের সামনের ঝোপ-জঙ্গলটা প্রচণ্ডভাবে দুলছে। তাঁরা দাঁড়িয়ে পড়লেন। শটগান ও রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কিন্তু শেষ মুহূর্তে বাঘটা আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত বদলাল। সবসময় তাড়া করে মানুষ মারতে অভ্যস্ত সে। এর আগে কোনও লোক মানুষখেকোটাকে অনুসরণ করবার সাহস দেখায়নি। আরও একবার চারদিক প্রকম্পিত করে গর্জে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। এন্ডারসন কেবল এক পলকের জন্য বাদামী-লাল রঙের একটা বস্তুকে লাফিয়ে উঠে ঝোপের ভিতর পড়তে দেখলেন। তিনি চেষ্টা করলে গুলি করতে পারতেন, কিন্তু কেন যে করলেন না নিজেও বলতে পারবেন না।

বাঘটা নিঃসন্দেহে প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত ছিল। কারণ মড়িটা খুঁজে পাওয়ার পর দেখা গেল এর অর্ধেকের বেশি অংশ এই অল্প সময়ের মধ্যেই খেয়ে ফেলেছে। কেবল মাথা, হাত, পা ও পাঁজরের কিছু অংশ বাকী। এন্ডারসন আর স্ট্যানলি নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন না। তাঁরা অভিজ্ঞতা থেকে জানেন গভীর নীরবতায় মানুষের নিচু কণ্ঠও অনেক দূর পর্যন্ত শোনা যায়।

এরপর অপ্রত্যাশিত ও অভাবনীয় একটা ঘটনা ঘটল। অদ্ভুত এই প্রাণীটা পালানোর চিন্তা বাদ দিয়ে এখন তাঁদের দিকেই ছুটে আসছে। বাঘ যতই কাছে আসছে ওটার গর্জন ততই তীব্রতর হচ্ছে। শব্দের প্রচণ্ড তীব্রতায় তাদের পায়ের নীচের মাটি থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকা শব্দের প্রচণ্ডতা প্রমাণ করছে বাঘটা বিপজ্জনকভাবে তাঁদের কাছে চলে আসছে। এদিকে এন্ডারসনরা এখনও মানুষখেকোটাকে দেখতে পাননি, কারণ ঘন ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আসছে সে। তাঁরা শুধু দেখছেন তাঁদের সামনের ঝোপ-জঙ্গলগুলো প্রচণ্ড ভাবে কাঁপছে।

বাঘটার আচরণ কিছুটা অস্বাভাবিক মনে হলেও, এমনটি ঘটতেই পারে। জঙ্গলে নির্দিষ্ট কোনও নিয়ম নেই, এবং এখানকার দুটো প্রাণী কোনওভাবেই এক নয়।

আরও একবার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁরা মানুষখেকোটার মুখোমুখি হওয়ার জন্য ঘুরলেন। আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁদের কাজ সহজ করে দিয়েছে বাঘ। আর কয়েক মুহূর্ত পরেই বাঘটা তার চেহারা দেখাবে।

কিন্তু সে মুহূর্তটা আর এল না। একেবারে শেষ সময়ে আবারও তার সিদ্ধান্ত বদল করল বাঘ। তারপর দেখা না দিয়েই তাঁদেরকে আর মড়িটাকে ঘিরে চক্কর দিতে লাগল, সেই সাথে চলল প্রচণ্ড কান ফাটানো শব্দে গর্জন। বাঘটার উদ্দেশ্য এখন পরিষ্কার। সাহস হারিয়ে ফেলার পর প্রচণ্ড শব্দ করে এন্ডারসন ও স্ট্যানলিকে ভয় দেখাতে চাইছে, যাতে মড়ির কাছ থেকে দূরে সরে যান তাঁরা।

এসময় এন্ডারসনের মাথায় বুদ্ধিটা আসল। মানুষখেকোটা তাঁদের দুজনকেই এগিয়ে আসতে দেখেছে। এখন তাঁদের দুজনের একজন যদি এখান থেকে চলে যান, এবং অন্য জন মড়ির আশপাশে কোথাও বাঘের জন্য লুকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন, তবে মানুষখেকোটা বিষয়টা ধরতে পেরে সতর্ক হয়ে উঠবে? রাস্তা পরিষ্কার ভেবে ওটা কি নিজের শিকারের কাছে ফিরে আসবে? তাঁদের মধ্যে যে এখান থেকে সরে পড়বেন বাঘটা কি তাঁকে অনুসরণ ও আক্রমণ করতে উদ্যত হবে? তাঁদের চতুর্দিকে চক্কর দিতে দিতে ওটা কি পুরো বিষয়টা পর্যবেক্ষণ করবে এবং মড়ির কাছে যিনি থেকে যাবেন তাঁর উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে?

ডাক্তারের অস্ত্র একটা শটগান। এন্ডারসন যদি এখানে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ডাক্তারকে ফিরে যেতে বলেন তবে বাঘটার তাঁকে অনুসরণ করার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। সেক্ষেত্রে স্ট্যানলি একটা বেশ বড় ধরনের সমস্যার মুখে পড়ে যেতে পারেন। আবার এন্ডারসন যদি স্ট্যানলিকে এখানে রেখে নিজে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নেন এবং বাঘটা তাঁর বদলে স্ট্যানলিকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয় তা হলেও পরিস্থিতির হেরফের হচ্ছে না। তাঁর সামনে এই মুহূর্তে একটা রাস্তাই খোলা, তা হলো স্ট্যানলিকে নিজের রাইফেলটা অফার করা।

সত্যি কথা বলতে কী এই সমাধানেও এন্ডারসন খুব একটা খুশি নন। কারণ বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে তিনি দ্বিধাহীনভাবে তাঁর .৪০৫ রাইফেলের উপর আস্থা রাখতে পারেন। তাঁরা যদি নিজেদের মধ্যে অস্ত্র বদল করেন তবে তাঁদের দু'জনের হাতেই থাকবে এমন দুটি অস্ত্র যার সাথে তাঁরা সম্পূর্ণ অপরিচিত। তা ছাড়া একটি মানুষখেকো বাঘের মুখোমুখি হওয়ার জন্য শটগান মোটেই উপযোগী অস্ত্র নয়।

স্ট্যানলির মাথাতেও এই চিন্তাগুলোই ঘুরপাক খাচ্ছে। সমস্ত সিদ্ধান্তহীনতার অবসান ঘটিয়ে তাঁর কানে কানে জানালেন, এন্ডারসন এখানে লুকিয়ে থাকবেন আর তিনি পিছু হটবেন। কোনও কথা না বলে এন্ডারসন নিজের রাইফেলটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে স্ট্যানলির শটগানটা নেবার জন্য হাত বাড়ালেন। এদিকে বাঘটা এখন তাঁদেরকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে আর ঘর ঘর শব্দ ও গর্জন করে চলেছে। এন্ডারসন এখন যেখানে আছেন তার কাছেই ত্রিশ ফুট ব্যাসের একটা ঝোপ।

উচ্চতা বড়জোর চার ফুট, তবে নীচের মাটি পুরোপুরি ঝোপ ও সবুজ গুল্মে ঢেকে আছে। এটা ছাড়া আশপাশে লুকিয়ে থাকার মত বড় গাছ কিংবা পাথর নেই। এন্ডারসন পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে ঝোপটার কাছে পৌঁছে গেলেন এবং রাইফেলটা প্রস্তুত রেখে হামাগুড়ি দিয়ে ওটার ভিতর ঢুকে পড়লেন।

যেহেতু তিনি এখান থেকে চলে গেছেন বুঝতে পারলেই বাঘটা আবার মড়ির কাছে ফিরে আসতে পারে, তাই স্ট্যানলি জোরে কেশে উঠে নিজের সাথে শব্দ করে কথা বলতে বলতে ফিরে যাচ্ছেন কুঁড়ের দিকে চলে যাওয়া রাস্তাটা ধরে।

কথা বলেই স্ট্যানলি ভুলটা করে বসলেন। বাঘ সব কিছু ভুলে তাঁকেই অনুসরণ করল।

ব্যাপারটা এন্ডারসনকে অস্থির করে তুলল। তাঁর বন্ধুর জীবন যখন চরম সংকটের মুখে, তখন তিনি কীভাবে জঙ্গলের মধ্যে নিশ্চিন্তে লুকিয়ে বসে থাকেন? তিনি চুপিচুপি মানুষখেকোটার পিছু নেবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

এক পা এক পা করে পিছু হটছেন ডাক্তার। বাঘটা যেদিক থেকে তাঁকে অনুসরণ করছে বলে সন্দেহ করছেন, সেদিকে তাঁর লোডেড শটগানটা তাক করে রেখেছেন। এন্ডারসনও যে বাঘটাকে অনুসরণ করছেন, সে-সম্পর্কে তাঁর কোনও ধারণাই নেই।

বেশ কিছুটা সময় ক্রোধে উন্মত্ত আচরণ করার পর আবার নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়েছে বাঘ। এখন নীরবে সে-ই লোকটার পিছু নিয়েছে, যে তাকে অনুসরণ করার দুঃসাহস দেখিয়েছে। তবে তার জানা নেই পিছন থেকে দ্বিতীয় একজন মানুষ তাকে অনুসরণ করছে। এদিকে বাঘ ও স্ট্যানলির পিছু নিয়ে খুব সতর্কতার সাথে হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছেন এন্ডারসন। তবে বাঘ বা স্ট্যানলিকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন না।

স্ট্যানলি ও এন্ডারসনের মধ্যকার দূরত্ব চল্লিশ হতে পঞ্চাশ গজের ভিতরে এবং বাঘটা তাদের মাঝখানে কোথাও আছে।

এন্ডারসন অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বাঘটাকে অনুসরণ করছেন। পিছন থেকে তাঁকে অনুসরণ করা হচ্ছে এটা জানা না থাকায় মানুষখেকোটা এখনও অবিচল ভাবে স্ট্যানলির পিছু পিছু এগুচ্ছে, এদিকে বাঘটার গর্জন থেমে যাওয়ায় এমনিতেই চিন্তিত স্ট্যানলি, এখন মানুষখেকোটা কানফাটানো শব্দে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার আগেই কি তিনি কুঁড়ের সামনের খোলা ট্র্যাকে পৌঁছে যেতে পারবেন কি না, এই ভেবে রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।

তারপরেই দ্রুত ঘটনাগুলো ঘটতে আরম্ভ করল। ডাক্তার কুঁড়ের দিকে চলে যাওয়া খোলা ট্র্যাকে পৌঁছে গেলেন। বাঘটা চারদিকের নীরবতা ভেঙে দিয়ে ভয়ঙ্কর শব্দে গর্জন করে উঠল। এদিকে এন্ডারসন সব কিছু শুনছেন, কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। তাঁর এ-ও জানা নেই মানুষখেকোটা কি স্ট্যানলিকে আক্রমণ করছে, নাকি শেষ মুহূর্তে ওটা তাঁর উপস্থিতি টের পেয়ে এখন এদিকেই তেড়ে আসছে।

ডাক্তার গুলি করলেন। তার গুলি এন্ডারসনকে চমকে একেবারে কাছেই, মাটিতে এসে বিঁধল। গুলির প্রচণ্ড শব্দে আতঙ্কিত প্রাণীটা আক্রমণের সাহস

হারাল। ঘুরে এন্ডারসনের পাশ দিয়ে পালানোর জন্য লাফ দিল। বাঘটিকে ছুটে আসতে দেখে এন্ডারসন কাঁধে বন্দুক তুলে নিলেন। প্রায় পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করলেন তিনি।

কয়েক মিনিট পর একটু সুস্থির হয়ে স্ট্যানলি জানালেন, এন্ডারসনের গুলিটা মাত্র কয়েক ইঞ্চির জন্য তার মাথা মিস করেছে। অনিচ্ছাকৃত ভাবে হলেও বাঘটা এমন একটা ঘটনা ঘটাতে প্রায় সফল হয়ে গিয়েছিল সে যা নিজস্ব কৌশল আর বিচার-বুদ্ধির মাধ্যমে পারেনি।

তবে বাঘটা ব্যর্থ হলেও এন্ডারসন আর স্ট্যানলি কিন্তু এখনও তাঁদের সফলতার ব্যাপারে আশাবাদী। তাঁরা দুজনেই অভিজ্ঞ শিকারী। তাঁরা যখন ট্রিগারে চাপ দেন তখন গুলি করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। তাঁরা দুজনেই পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে গুলি করেছেন। বাঘটা হয়তোবা আশপাশে কোথাও আহত অবস্থায় পড়ে আছে, সম্ভবত মারাই গেছে। এদিকে উত্তেজনার কারণে তাঁরা ভুলেই বসে আছেন যে স্ট্যানলির গুলিটা মাটিতে বিঁধতে দেখেছেন এন্ডারসন, অন্যদিকে তাঁর গুলিটা স্ট্যানলির মাথার পাশ দিয়ে চলে গেছে।

কাজেই তাঁরা চতুর্দিকে বাঘটার খোঁজ করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজেও রক্ত কিংবা মৃত বা আহত বাঘের কোনও চিহ্ন তাঁরা পেলেন না।

প্রচণ্ড হতাশা নিয়ে তাঁরা দুজন কুঁড়েতে পৌছালেন এবং সেখান থেকে ট্যাগার্থির রাস্তা ধরলেন।

সাধারণত কোনও বাঘকে লক্ষ্য করে গুলি করার পর দীর্ঘসময় ওটা ওই এলাকা এড়িয়ে চলে। আর এ বাঘটা লক্ষ্য করে একবার না, দু'বার গুলি ছোঁড়া হয়েছে। তবে এই মানুষখেকোটা ইতিমধ্যে দু'বার এমন আচরণ করেছে যা অন্য সব বাঘের সাথে ঠিক খাপ খায় না। পালিয়ে যেয়ে ফিরে আসল, তারপর আবার পালিয়ে গেল। ওটা কি আবারও মড়ির কাছে ফিরে আসবে? এন্ডারসন ভেবে দেখলেন না ফেরার সম্ভাবনা ৯৯%। তারপরও বাঘটা ফিরে আসার ১% সম্ভাবনা রয়েই যাচ্ছে।

তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং ডাক্তারকে সম্ভাবনাটা ব্যাখ্যা করলেন। স্ট্যানলি সমর্থন জানিয়ে মাথা নাড়তেই তাঁরা আবার কুঁড়ের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন।

কুঁড়েয় ঢুকে দরজা বন্ধ করে বসে থাকা লোকটা ও মহিলা দুজন এন্ডারসনদের এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে দেখে রীতিমত বিস্মিত হলো। ফিরে আসবার কারণ জানাতেই তারা খুশি হয়ে উঠল। তবে এন্ডারসনদের যে এ মুহূর্তে সফল হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই, এ ধারণাটি প্রকাশ করতেও দ্বিধা করল না তারা।

মড়িটা যেখানে পড়ে আছে সেদিকে রওয়ানা হলেন তাঁরা। জঙ্গলের যে অংশে মানুষখেকোটার সাথে তাদের অদ্ভুত লুকোচুরি খেলা হয়েছে সে জায়গাটা অতিক্রমের সময় তাঁরা খুব সতর্ক থাকলেন। কিন্তু বাঘটার কোনও চিহ্নই তাঁরা দেখতে পেলেন না।

এন্ডারসন এখন কী করবেন? মানুষখেকোটা ফিরে আসার যে সামান্য সুযোগ

আছে তিনি এটাকে ভুলে যেতে চাচ্ছেন না, আবার ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থেকে সরাসরি বাঘের মুখে নিজেকে তুলে দিতেও তিনি রাজী নন।

এন্ডারসন যখন অনেক চিন্তা করেও এই সমস্যার কোনও কূল-কিনারা করতে পারছেন না, এসময় ডাক্তারের মাথায় দুর্দান্ত একটা বুদ্ধি খেলে গেল। অবশ্য কুঁড়ের পুরুষ ও মহিলা দু'জনের সাহায্য ছাড়া তাঁর পরিকল্পনাটা সফল করা সম্ভব নয়। কারণ তাদেরকেই মড়ির কাছে একটা গর্ত খুঁড়তে হবে। গর্তটা অবশ্যই ডাক্তারের অবস্থান নেয়া ও লুকিয়ে থাকার মত প্রশস্ত আর গভীর হতে হবে। এখানেই তিনি মানুষখেকো আসার আগে পর্যন্ত লুকিয়ে থাকবেন। তারপর পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করার সুযোগটা নেবেন।

ইতিমধ্যে তিনটের বেশি বেজে গেছে। তাঁদের অবশ্যই দ্রুত কাজ করতে হবে। কাজেই মন থেকে সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে এন্ডারসন ও স্ট্যানলি দ্রুত কুঁড়েতে ফিরে চললেন। এবং এখানে এসে তাঁরা জানতে পারলেন কুঁড়ের অধিবাসীদের কাছে মাটি খোঁড়ার কোনও যন্ত্রপাতি নেই। দীর্ঘদিন এ এলাকায় রোগীদের চিকিৎসা করে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠা ডাক্তার এবার তাঁর ভেল্কি দেখালেন। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে তিনি ট্যাগার্থি থেকে ছয়জন সাহায্যকারী লোক নিয়ে আসলেন, যারা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে গর্ত খোঁড়ার জন্য শাবল, কুঠার ও বিশাল আকৃতির দুটি ঝুড়ি। কুঁড়ের পুরুষ ও মহিলা সহ এন্ডারসন এবার স্ট্যানলি ট্যাগার্থির থেকে আসা ছয় সাহায্যকারীর সাথে কাজে নেমে পড়লেন। অত্যন্ত দ্রুততার সাথে গর্ত খোঁড়া ও গর্ত থেকে ওঠানো মাটি দূরে সরিয়ে ফেলার কাজ শেষ হলো। এন্ডারসন অনুমান করলেন মূল পরিকল্পনাকারী হিসাবে ডাক্তার অবশ্যই নিজে গর্তের ভেতর বসতে চাইবেন। তিনি এটাও জানেন শত তর্ক-বিতর্ক করেও তাঁকে এই সিদ্ধান্ত থেকে টলানো যাবে না। তিনি যদি তাঁকে বুঝার চেষ্টা করেন, এমন একটা ভয়ঙ্কর প্রাণীর মুখোমুখি হবার জন্য শটগান মোটেই উপযোগী নয়, তবে ডাক্তার জবাব দেবেন এত কাছ থেকে গুলি করার জন্য শটগানই সবচেয়ে উপযোগী। এক পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে শটগান যে চমৎকার কাজ করে তা এন্ডারসনের পক্ষেও অস্বীকার করা সম্ভব হবে না। অতএব সেদিনের মত মানুষখেকো শিকারের চিন্তা বাদ দিতে হলো তাঁকে। ঠিক হলো রাত কাটানোর জন্য ট্যাগার্থি ফিরে যাবেন এন্ডারসন।

ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, ঠিক তখনই ওখান থেকে দুজন লোক এসে হাজির হলো। ডাক্তারের খোঁজে পুরো রাস্তাটাই তারা দৌড়াতে দৌড়াতে এসেছে। দু'জনের একজন গ্রামের তরুণ মোড়ল আর অন্যজন তার ভৃত্য। মোড়ল জানালেন, তাঁর সন্তানসম্ভবা স্ত্রী পানির পাত্র তুলতে গিয়ে পিছলে পড়ে গেছে। তার বাচ্চা প্রসব হয়ে গেছে, এবং এখন তার প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে। ডাক্তারকে অবশ্যই এখনই তার সাথে যেতে হবে।

কথা বলার সময়ই মোড়ল মাটিতে খোঁড়া গর্ত ও স্ট্যানলির প্রস্তুতি দেখে বুঝে নিলেন ডাক্তার বাঘ শিকারের জন্য গর্তে নামছেন। কাজেই সে ডাক্তারকে তার সাথে যেতে রাজী করানোর জন্য উচ্চ স্বরে বিলাপ শুরু করল।

অগত্যা এন্ডারসনকে গর্তে বসবার সুযোগ দিয়ে কিছটা অনিচ্ছাসত্ত্বে হলেও

স্ট্যানলিকে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিতে হলো। তার মানে এন্ডারসন একা হয়ে গেলেন।

চারদিকে দ্রুত অন্ধকার নেমে আসছে দেখে পিছলে গর্তটার মধ্যে নেমে আসলেন তিনি। গর্তের নীচের মাটিতে উবু হয়ে বসে উপরে তাকাতেই মাথার উপর আকাশের গোলাকার একটা অংশ চোখে পড়ল। এবার এন্ডারসন তাঁর লোডেড উইনচেস্টার রাইফেলের বাঁট উরুর উপর রেখে উপরের অংশ কোনাকুনিভাবে অন্য প্রান্তের দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখলেন।

গর্তের ভিতর প্রায় কবরের নীরবতা নেমে এসেছে, কদাচিত সারা দিনের ব্যস্ততা শেষে রাতের আশ্রয়ে ফিরে চলা বনমোরগ, ময়ূর ও অন্য পাখিদের ক্ষীণ ডাক ভেসে আসছে। এখানে বসে মানুষখেকোটার করা মৃদু কোনও শব্দ শোনবার আশা দুরাশা ছাড়া আর কিছু নয়।

একটা দীর্ঘ কালো কাঠামো যখন এন্ডারসনের মাথার উপরের বৃত্তাকার আকাশ পথটা অতিক্রম করল তখন পুরো প্রকৃতি অন্ধকারে ঢেকে গেছে। একটা নাইটজার, একটু নীচ দিয়ে উড়ে যেয়ে এটা মড়ির ছিন্ন-ভিন্ন হাড়গুলোর সাথে লেগে থাকা মাংসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া পোকা-মাকড়গুলোকে খাবার সম্ভাবনা যাচাই করছে, মড়ির উপর বসার প্রস্তুতি নিতে থাকা কয়েকটা মাছি এন্ডারসনের মাথার উপর ভন ভন শব্দে উড়ে বেড়াচ্ছে। এদিকে সারা দিন সূর্যের তাপে সিদ্ধ হওয়া মড়িটা থেকে বের হওয়া প্রচণ্ড দুর্গন্ধ বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, মনে হচ্ছে এটা মাটির সাথে আটকে আছে এবং এখন জোয়ারের মত গর্তের ভিতর নেমে আসছে।

বাঘটা কি চলে এসেছে? তবে কি ওটা এই মুহূর্তে মড়িটা খাচ্ছে? সে কি জানে তার এত কাছে অস্বাভাবিক কিছু একটা আছে?

এন্ডারসন ইতিমধ্যে ভাবতে শুরু করেছেন মোড়লের স্ত্রীকে বাঁচানোর চেষ্টায় সফল হয়েছেন স্ট্যানলি।

এসময়ই তিনি প্রথমবারের মত শব্দটা শুনলেন। ক্ষীণ, কিন্তু নিশ্চিতভাবেই কারও জোরে শ্বাস নেওয়ার শব্দ।

এটা অবশ্যই মানুষখেকোটার আওয়াজ! বাঘটা তাঁর অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত। গুড়ি মেরে আস্তে আস্তে এদিকেই এগিয়ে আসছে। আপনাআপনিই তাঁর হাত রাইফেলের উপর চলে আসল।

শব্দটা এক মুহূর্তের জন্য থেমে গেল, তারপরে তিনি হঠাৎ বেশ জোরে একটা হিস্ হিস্ শব্দ শুনলেন। আবার সব কিছু নীরব হয়ে গেল। তবে কি মানুষখেকোটা নয়, মড়ি অতিক্রম করছে একটা চিতাবাঘ?

বেশ কিছুটা সময় তিনি আর কোনও শব্দ শুনতে পেলেন না। তারপরই ভোঁতা একটা শব্দ হলো, যেন কোনও কিছু তার মাথার উপর দিয়ে গ্লাইড করে গেল। বড় কোনও সাপই কি তবে শব্দটা করেছে? একটা কিংকোবরা? আরও দক্ষিণের জঙ্গলগুলোর তুলনায় এখানকার জঙ্গলের গাছপালা বেশি আর্দ্র হওয়ায় এই বিশেষ প্রজাতির সাপদের এদিককার জঙ্গলে ভালই দেখা যায়।

আবার নীরবতা। কান দুটোকে খাড়া করে রেখে এন্ডারসন মাথার উপরে মৃদু

আলোর উৎস দুটোর দিকে তাকালেন। এখনও জ্বলজ্বল করছে। বেশ কিছুক্ষণ তাঁরা দুটোর সঙ্গ উপভোগ করছেন।

জোরে ফট করে একটা শব্দ হলো। তারপরই মানুষখেকোটা এই মাত্র ভেঙে ফেলা হাড়টা চিবাতে শুরু করল।

খাবার সময় বাঘ যে শব্দ করে তা থেকে তার মেজাজ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। সাধারণত তৃপ্তি ও সন্তোষের সাথে এই কাজটা করে সে। পর্যায়ক্রমে দাঁত দিয়ে মাংস ছেঁড়া ও চিবানোর শব্দের সাথে সাথে ভোজনপর্ব এগুতে থাকে। এখানে দুটো বাঘ উপস্থিত। কিংবা ওটা একটা বাঘিনী, সাথে তার বাচ্চা আছে। কারণ চাপা গর্জন শোনা যাচ্ছে, এবং কোনও কিছু নিয়ে একাধিক প্রাণীর বাক-বিতণ্ডার শব্দ শোনা যাচ্ছে। আবার মাঝে মাঝেই হুমকি মিশ্রিত ঘর ঘর শব্দ প্রমাণ করছে অন্য বাঘটা, কিংবা কোনও একটি বাচ্চা মড়ির খুব কাছাকাছি চলে এসেছে।

যদিও বাঘিনী তার বাচ্চাদের প্রচণ্ড ভালবাসে, এবং এমন নজিরও আছে যে নিজের বাচ্চাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবন দিয়ে দিয়েছে, তারপরও নিজে পূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে খাওয়া শেষ করার আগে তার বাচ্চাদেরও এর ভাগ দেয় না সে।

এন্ডারসন গর্তের ভিতর বসে তাঁর পরবর্তী করণীয় কী তা গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন, বাঘটাকে গুলি করার চেষ্টা করতে হলে তাঁকে অবশ্যই গর্তের কিনারা থেকে উপরে উঁকি মেরে ওটার অবস্থান চিহ্নিত করতে হবে। তারপর তাঁকে রাইফেলটা গর্ত থেকে বের করে নিশানা ঠিক করার জন্য গর্তের কিনারার মাটিতে ঠেস দিতে হবে। আর এ কাজগুলো করতে গিয়ে তাঁকে বেশ কিছুটা নড়াচড়া করতে হবে।

তবে বাঘ কিংবা বাঘিনীটার মনোযোগ যদি অন্য দিকে থাকে তবে তিনি গুলি করার একটা সুযোগ পেলেও পেতে পারেন। কিন্তু এখানে দ্বিতীয় একটা বাঘ উপস্থিত। এমনকী নীচ থেকে বের হয়ে আসা এন্ডারসনের মাথা, কাঁধ কিংবা রাইফেল যদি বাচ্চাদের চোখে পড়ে যায় তা হলেও সমস্যা।

এন্ডারসনের হাতে অবশ্য আর একটা বিকল্প আছে, তা হলো চুপচাপ গর্তের মধ্যে বসে থেকে এদের খাওয়া শেষ করতে দেয়া। তারপর নিজেদের পথে চলে যাক। কিন্তু তিনি এখানে এসেছেন মানুষখেকোটাকে মারতে; গর্তের ভিতর লুকিয়ে বসে থাকতে নয়।

বাঘটা এখনও খেয়েই চলেছে, সেই সাথে মাঝে মাঝেই অন্য বাঘটা কিংবা বাচ্চাদের মড়ির কাছ থেকে সরিয়ে রাখার জন্য ক্রুদ্ধ স্বরে গর্জন করে উঠছে।

শেষ পর্যন্ত এন্ডারসন তাঁর পায়ের আঙুল ও হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসতে পারলেন। এবং পায়ের ছড়ানো আঙুলের উপর শরীরের ভর সহনশীল করার জন্য তাঁর হাত দুটোকে নীচে ছড়িয়ে দিলেন। তারপর খুব সাবধানে উঠতে শুরু করলেন।

বেশ কিছুটা সময় পার হলো। তাঁর হাত ও পায়ে ছড়িয়ে পড়ছে যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি। কিন্তু তিনি তাড়াহুড়ো করতে পারেন না। কাছে চলে আসা বাঘের গর্জন প্রচণ্ড হয়ে ওঠার পরেও না। আতঙ্কজনক একটা অনুভূতি যেন তাঁকে চেপে

ধরতে চাচ্ছে।

এদিকে শরীরের ভার বহনের জন্য অনেকটা সময় ছড়িয়ে রাখায় তার হাত ইতিমধ্যে কাঁপতে শুরু করেছে। হঠাৎ এন্ডারসন বুঝতে পারলেন তাঁর মাথার উপরের অংশ মাটির সমতলে পৌঁছে গেছে। তার পক্ষে কোনওভাবেই আর দেরি করা সম্ভব নয়। কারণ বাঘ বা বাঘিনী যদি এখন গর্তের দিকে তাকায় তবে তাঁকে দেখে ফেলবে। কিন্তু তিনি ওগুলোকে দেখতে পাবেন না। তিনি দ্রুত উপরে তুললেন মাথাটা। তাঁর চোখ মাটির সমতলে পৌঁছে গেল।

কয়েক হাত দূরে পাশ ফিরে বিশাল আকৃতির একটা বাঘ পেট ছড়িয়ে বসে আছে। হতভাগ্য লোকটার শরীরের একটা অংশ সামনের থাবা দুটো দিয়ে আঁকড়ে ধরে চিবুচ্ছে ওটা। তবে আরও আতঙ্কজনক ব্যাপার হলো, কিছুটা দূরে বাঘটার মুখোমুখি আরও একটা বিশাল আকৃতির পূর্ণ-বয়স্ক বাঘ বসে আছে। উৎসুক দৃষ্টিতে ওটা সঙ্গীর খাওয়া দেখছে। এই দ্বিতীয় বাঘটা এন্ডারসনেরও মুখোমুখি। এবং গর্তের উপর উঠে আসা তাঁর মাথাটা দেখতে ওটার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হলো না।

বিস্ময়ে হতবাক প্রাণীটা গর্জন করে উঠে দাঁড়িয়ে গেল। এন্ডারসন দ্রুত মাথাটা নিচু করে ফেললেন।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ঘটনাটা ঘটে গেল। ভোজনরত বাঘটা অলসভাবে বসে নেই। সঙ্গীকে গর্জন করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াতে দেখে এবং ওটার উত্তেজনার কারণ যে গর্ত থেকে বের হয়ে আসা এন্ডারসনের মাথা তা না জানা থাকায়, প্রাণীটা উপসংহারে পৌঁছে গেল–তার সঙ্গী মড়ির ভাগ আদায়ের জন্য লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রচণ্ড একটা গর্জন করে উঠল ওটা। তারপর সঙ্গীকে আক্রমণ করে বসল।

এন্ডারসন বুঝলেন এখন তাঁর সুযোগ। প্রাণী দুটো নিজেদের নিয়ে এতই ব্যস্ত যে তাঁর দিকে নজর দেবার সময় পাবে না।

দ্রুত নিজেকে উপরে তুলে ফেললেন তিনি। প্রথমে রাইফেল, তারপর মাথা সবশেষে তাঁর কাঁধ মাটির সমতলে পৌঁছাল। কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। কারণ যুদ্ধরত প্রাণীগুলোর ছড়িয়ে দেয়া ধুলোয় চারদিক ঢেকে গেছে। এমনকী এদের চিৎকার কিংবা গর্জনও তিনি শুনতে পেলেন না।

সম্ভবত দ্বিতীয় বাঘটা রণেভঙ্গ দিয়ে পালিয়েছে। আর মানুষখেকোটা সেটাকে অনুসরণ করছে।

জঙ্গল এখন পুরোপুরি শান্ত। এন্ডারসন এর কোনও কূল-কিনারা করতে পারছেন না। পুরো বিষয়টাই অস্বাভাবিক। এসময়ই তাঁর মাথায় চিন্তাটা আসল। মানুষখেকোটা যদি আসলেই সঙ্গীর পিছু ধাওয়া করে ওটাকে তাড়িয়ে দিয়ে থাকে তবে সে নিঃসন্দেহে মড়ির বাকি অংশ খাবার জন্য ফিরে আসবে। কাজেই দেরি না করে তিনি আবার গর্তে ঢুকে পড়লেন, অপেক্ষায় আছেন কখন মানুষখেকোটা ফিরবে।

এভাবে প্রায় আধ ঘণ্টা পার হলো। তারপরই একজন মানুষের উঁচু প্রলম্বিত কণ্ঠের আর্তনাদ শুনতে পেলেন এন্ডারসন, রাতের নীরবতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে

দিয়ে ক্রমান্বয়ে তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল সেই আর্তচিৎকার, তারপর হঠাৎ করেই থেমে গেল। শব্দের তীব্রতা কমে অনেকটা ফোঁপানোর মত আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। কেউ যেন কারও গলা টিপে ধরেছে। তারপরই আরও চিৎকার ও আর্তনাদ শুনলেন তিনি। আরও চড়া, আরও তীব্র। এবারের কণ্ঠের মালিক কুঁড়ের পুরুষটা ও মহিলাদের একজন। সাহায্যের জন্য তারা চিৎকার করছে।

আর তখনই এন্ডারসন বুঝে ফেললন আসলে কী ঘটেছে। দ্বিতীয় মহিলাকে মানুষখেকো নিয়ে গেছে। অন্য বাঘটাকে তাড়া করার সময় কিংবা তাঁকে বা তাঁর রাইফেলটাকে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে পালানোর সময় ওটা নিঃসন্দেহে পুরুষ ও স্ত্রী লোক দুটো যে কুঁড়েতে শুয়েছে সেটাকে পাশ কাটিয়েছে। কিন্তু তার দ্বিতীয় শিকারকে বাঘটা পেল কীভাবে? সম্ভবত সেটা এত ক্রুদ্ধ হয়ে ছিল যে মহিলাটা যে কুঁড়েতে ঘুমিয়েছে সেটা থেকে তাকে সরাসরি টেনে-হিঁচড়ে বের করে নিয়ে আসে। বাঘটা অবশ্যই এমন ত্বরিত ও প্রচণ্ড আক্রমণে যাবার মত ক্ষুধার্ত ছিল না, কারণ একটু আগেই এটা বেশ ভাল পরিমাণ খাওয়া-দাওয়া করেছে।

এন্ডারসন ঠিক বুঝতে পারছেন না তাঁর এখন কী করা উচিত। তিনি কি গর্তের ভিতরই অপেক্ষা করবেন, নাকি কুঁড়ের দিকে দৌড়ে যাবেন? নতুন আর তাজা একটা শিকার পেয়ে যাবার পর মানুষখেকোটা প্রথম মড়ির রয়ে যাওয়া ক'খানা হাড়গোড়ের কাছে ফেরার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। এদিকে এই অন্ধকারে তাঁর পক্ষে দ্বিতীয় শিকার নিয়ে চলে যাওয়া বাঘটাকে অনুসরণ অসম্ভব।

শেষ পর্যন্ত তিনি যেখানে আছেন সেখানেই অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। মানুষখেকোটার তাড়া খেয়ে পালিয়ে যাওয়া বাঘটা এখানে ফিরে আসার একটা সম্ভাবনা আছে। সেক্ষেত্রে তিনি ওটাকে গুলি করার একটা সুযোগ পাবেন। যদিও এই বাঘটা মানুষখেকো না, তবে এটা যে মানুষখেকোটার সঙ্গে থাকতে থাকতে অল্প কিছুদিনের মধ্যে পুরোপুরি মানুষখেকোতে পরিণত হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এন্ডারসনের মনে পড়ল কী আগ্রহ নিয়ে মড়িটার ভাগ পাবার জন্য এটা মানুষখেকোটার পাশে বসে অপেক্ষা করছিল।

গর্তের ভিতর অস্বস্তিকর গরমে বসে থাকা এমনিতেই কষ্টকর, তার উপর আবার ছোট পিঁপড়া আর পোকামাকড়ের কামড়ে এন্ডারসন রীতিমত অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। তবে রাত চারটের আগ পর্যন্ত মড়িটার কাছে কেউ আসল না। জঙ্গলের নীরবতাও অটুট থাকল। তারপর অবশ্য একটা হায়েনা হাড়গুলো আবিষ্কার করল। সেই সাথে পরিস্থিতি বদলে গেল। বাঘের শরীরের গন্ধ পেয়েছে ওটা। তার জানা আছে চুরি করাটা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। সে এ-ও জানে যে চুরির দায়ে ধরা পড়ার একটাই অর্থ–নিশ্চিত মৃত্যু। একদিকে মড়ি খাবার লোভ, অন্যদিকে বাঘের হাতে ধরা পড়লে মৃত্যুর আশঙ্কা, এই দুইয়ের মধ্যে পড়ে ওটা ঠিক কী করবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। এই দ্বিধার বেড়াজালে জড়িয়ে পড়ে ওটা চিৎকার করতে লাগল। সেই সাথে পুরো বনকে জানিয়ে দিল সে একটা বিশাল সমস্যার মুখে পড়ে গেছে।

কিন্তু এতে করে পরিস্থিতির কোনরকম হেরফের হলো না। বাঘটা এখনও দেখা দেয়নি। তবে যে-কোনও সময় এখানে হাজির হতে পারে সেটা। আর বাঘ

এখানে উপস্থিত হয়ে যদি হায়েনাটাকে মড়ির কাছে দেখতে পায়, তবে হতভাগ্য প্রাণীটার ভাগ্যে কী ঘটবে তা সহজেই অনুমেয়। সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হলো এন্ডারসনের একেবারে কাছেই ঘটনাটা ঘটবে, কিন্তু তিনি এতে কোনও হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।

এন্ডারসনের উপরের খোলা আকাশে ক্ষীণ একটা আলোর রেখা দেখা দিতে শুরু করেছে, যদিও ভোর হতে এখনও কিছুটা বাকি। এদিকে হায়েনাটা চিৎকার থামিয়ে খাওয়া শুরু করেছে।

ওটার হাড় চিবানোর শব্দ শুনলেন এন্ডারসন। তারপরেই হায়েনাটার দ্রুতবেগে চলে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেলেন তিনি। কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছেন হতভাগ্য প্রাণীটা নিজের চোয়ালের মাঝখানে একটা মানুষের হাড় কামড়ে ধরে রুদ্ধশ্বাসে দৌড়াচ্ছে।

ভোর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। তারপর খুব সাবধানে গর্ত থেকে উঠে আসলেন। চারপাশ একেবারেই ফাঁকা, এবার প্রায় অবশ হয়ে যাওয়া পা দুটোকে নাড়াচাড়া করে রক্ত চলাচলের ব্যবস্থা করলেন। কী ঘটেছে দেখার জন্য কুঁড়ের দিকে রওয়ানা হলেন তিনি। সেখানে পৌঁছাতেই ভয়ঙ্কর একটা দৃশ্যের মুখোমুখি হলেন।

ঘরের কোণে জড়োসড়ো হয়ে লুকিয়ে রয়েছে লোকটা, স্ত্রীকে নিয়ে। তাদের কাছ থেকে মর্মান্তিক ও ভীতিপ্রদ গল্পটা শুনলেন তিনি। মানুষখেকোটার হাতে মারা পড়া প্রথম লোকটার স্ত্রী আর তারা দুজন একই কুঁড়েতে রাত কাটাবার সিদ্ধান্ত নেয়। তিনজন দুটো কুঁড়েতে ভাগ হয়ে থাকার চেয়ে একটা কুঁড়েতে থাকলে মনে নিরাপত্তার অনুভূতিটা বেশি কাজ করে। শোবার জন্য পুরুষ লোকটা ঘরের চার প্রান্তের বেড়াগুলো থেকে সমান দূরত্বে অবস্থিত কুঁড়ের মধ্যবর্তী অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গাটা বেছে নিল। লোকটার স্ত্রী তার বাম পাশে শুলো। দ্বিতীয় মহিলাকে তার পছন্দসই একটা জায়গায় শুয়ে পড়তে বলা হলো। সে কিছুটা ভয় পেয়েছিল, কিন্তু যেহেতু তার পক্ষে পুরুষ লোকটার ডান পাশে শোয়া সম্ভব নয়, সে তাদের কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে শোবার সিদ্ধান্ত নিল তাদের পা যেদিকে, তার বিপরীত পাশের বেড়ার কাছাকাছি একটা জায়গায় শুয়ে পড়ল।

কুঁড়েটা তুলনামূলকভাবে ছোটই। অনেকটা বর্গাকৃতি ঘরটার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ১২ ফুটের মত। কুঁড়ের ঠিক মাঝখানে শুয়ে পড়া পুরুষ ও স্ত্রী লোকটার জন্য ছয়ফুট জায়গা ছেড়ে দিয়ে এবং তাদের পা থেকে আরও তিনফুট দূরত্ব রেখে দ্বিতীয় মহিলাটি যে জায়গাটায় শুলো তার দূরত্ব কুঁড়ের এক প্রান্তের বেড়া থেকে এক গজের বেশি হবে না। ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামের এই কুঁড়েগুলোর নীচের প্রান্ত মাটি থেকে কয়েক ইঞ্চি উপরে থাকে, যেন ঘুণ পোকা রাতের অন্ধকারে নীচের প্রান্ত বেয়ে দেয়ালে উঠতে আর দিনের আলোয় কুঁড়ের বেড়া কাটতে না পারে। আর ঘর তৈরির এ বিশেষ পদ্ধতির কারণে কুঁড়ের চারপাশেই বেড়া আর নীচের মাটির মধ্যে কিছুটা জায়গা ফাঁকা বা উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে।

অন্য বাঘটাকে অনুসরণ করার কিংবা এন্ডারসনের শরীরটাকে উপরে উঠতে দেখে পালিয়ে আসার সময় বাঘটা কুঁড়ের একেবারে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। মড়ি

রেখে চলে আসতে হওয়ায় ওটার মেজাজ খুব তেতে ছিল। বাঘটা নিশ্চিতভাবেই কুঁড়ের নীচের খোলা জায়গাটা দিয়ে এক পলকের জন্য ঘুমন্ত মহিলাটাকে দেখতে পায়, কিংবা তার উপস্থিতি টের পায়। সামনের থাবা কুঁড়ের নীচের খোলা অংশ দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে হতভাগ্য মহিলাটাকে আঁকড়ে ধরে। তারপর তাকে বাইরে বের করে আনার জন্য টানতে শুরু করে।

মহিলাটার কান্না ও চিৎকারের শব্দ, যা এন্ডারসনও শুনতে পেয়েছেন, কুঁড়ের অপর দুজনকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে। সাথে সাথেই তারা চিৎকার শুরু করে। ইত্যবসরে মানুষখেকোটা মহিলাটার মাথা ও গলা কুঁড়ের বাইরে বের করে আনল। নখ দিয়ে তার নাড়িভুঁড়ি ফালাফালা করে দিয়ে তাকে মেরে ফেলতেও বেশি সময় নিল না সে। কিন্তু তারপরই বাধে বিপত্তি। মৃত মেয়েলোকটার শরীরের বাকি অংশ কুঁড়ের ভিতর আটকে গেল। বাঘ যখন তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তখন মহিলাটি শেষ অবলম্বন হিসাবে কুঁড়ের বেড়াকে দাঁড় করিয়ে রাখা দুটো বাঁশকে আঁকড়ে ধরে। বাঘের প্রচণ্ড শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে দুটো বাঁশই ভেঙে গেলেও, একটা বাঁশের এক প্রান্ত শাড়ী ও ব্লাউজ ভেদ করে তার মাংসের ভিতর সেঁধিয়ে যায়। এতেই মহিলার শরীরের বাকি অংশ বেড়ার অপর পাশে আটকা পড়ে।

প্রথমে আক্রান্ত মহিলার তীক্ষ্ণ চিৎকার, তারপর তার সঙ্গীদের চেঁচামেচিতে বাঘটা এমনিতেই কিছুটা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তারপর তার শরীরের একটা অংশ কুঁড়ের ভিতর আটকা পড়তে দেখে মানুষখেকোটা তার শিকারকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে এখানেই ফেলে রেখে দ্রুত পালিয়ে যায়। এন্ডারসনের সামনে পড়ে থাকা মৃতদেহটা এখানে বীভৎস এক দৃশ্যের অবতারণা করেছে। বাঘটা নখ দিয়ে তার বুক চিরে দিয়েছে এবং এক স্তনের উপর থেকে পাঁজর পর্যন্ত ফালাফালা করে ফেলেছে। তারপর এটা তার পেটের ডানপাশে কামড়ে ধরে এবং গলার ভিতরের বায়ুনালীটা ছিঁড়ে বের করে আনে। গলার হাড়গুলো ও ঝুলে থাকা চামড়াটা এখন কোনওভাবে মাথাটাকে দেহের বাকি অংশের সাথে আটকে রেখেছে। নিজের রক্তের একটা ছোটখাট পুকুরের মধ্যে এখন মৃতদেহটা পড়ে আছে।

তাদের সামনেই ঘটে যাওয়া ভয়ঙ্কর ঘটনাটা দেখে হতবিহ্বল হয়ে পড়া পুরুষ ও মহিলা মানুষখেকোটার চলে যাবার পরেও ঘরের অন্য প্রান্তে গুটিসুটি মেরে পড়েছিল। প্রতি মুহূর্তেই তারা বাঘটা আবার ফিরে আসার আশঙ্কা করছিল। তারা এতই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল যে চারদিক যে ফরসা হয়ে গেছে এটাও খেয়াল করেনি। এন্ডারসনের কুঁড়ের দিকে হেঁটে আসার শব্দ শুনে মানুষখেকোটা আবার ফিরে এসেছে মনে করে তারা গোঙাতে শুরু করে।

তিনি যে বাঘ নন, এটা বোঝানোর জন্য এন্ডারসন বাধ্য হয়ে উচ্চ স্বরে তাদের ডাকতে শুরু করেন। তাঁর ডাকে পুরুষ ও মহিলাটি যেন সংবিৎ ফিরে পেল। তারপরেই মাটিতে বসে পড়ে তারা কাঁদতে শুরু করল। গত রাতের ভয়ঙ্কর স্মৃতিও একই সাথে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাবার আনন্দ তাদের আবেগ-আপ্লুত করে ফেলল। শান্ত হয়ে পুরো ঘটনাটা এন্ডারসনকে খুলে বলতে

তারা বেশ কিছুটা সময় নিল।

তিনি যখন কুঁড়েতে ঢুকে পুনরায় ভিতরের ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা দেখছেন তখন গত সন্ধ্যায় গর্ত তৈরির কাজে তাদের সাহায্য করা কয়েকজন লোকসহ স্ট্যানলি এখানে হাজির হলেন। তিনি প্রায় পুরোটা রাত জেগে কাটালেও রাইফেলের গুলির কোনও শব্দ পাননি, অথচ এন্ডারসন যেখানে বসেছেন সেখান থেকে গুলি করলে এর শব্দ অবশ্যই বাতাসে ভেসে ট্যাগার্থি পৌঁছে যাওয়ার কথা। ডাক্তার সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন–হয় বাঘটা ফিরে আসেনি, নয়তো এন্ডারসন নিজেই বাঘের হাতে মারা পড়েছেন। কাজেই কী হয়েছে তদন্ত করে দেখার জন্য ভোর হতেই তিনি দৌড়ে এখানে হাজির হয়েছেন।

এন্ডারসন প্রথমেই স্ট্যানলির দিকে যে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন তা হলো–মোড়লের স্ত্রী কেমন আছে?

মানুষখেকোটার কথা বাদ দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে যাওয়ায় কিছুটা হতাশ ডাক্তার একটু সময় চুপ করে থেকে জানালেন–সে বিপদমুক্ত। এন্ডারসন তাঁকে পুরো ঘটনাটা খুলে বললেন এবং তারপরেই তারা দুজন তাদের পরবর্তী পরিকল্পনা দাঁড় করিয়ে ফেললেন।

তারা পুরুষ ও মহিলাটিকে মালামাল সহ কুঁড়ে থেকে বের করে আনলেন। আপাতত অন্যদের সাথে গ্রামে ফিরে যাবার পরামর্শ দিলেন তাদেরকে। ঠিক হলো এন্ডারসন মৃত স্ত্রী লোকটার লাশটা যে কুঁড়েতে পড়ে আছে সেখানে লুকিয়ে থাকবেন, অন্যদিকে স্ট্যানলি লুকোবেন পাশের কুঁড়েতে। স্বাভাবিক নিয়মে মানুষখেকোটা অবশ্যই তার শিকারের কাছে ফিরে আসবার কথা। কিন্তু এখানে দ্বিতীয় একটা বাঘ আছে, যেটা এখনও পুরোপুরি মানুষখেকো হয়নি। দ্বিতীয় কুঁড়েতে অপেক্ষায় থাকা ডাক্তার ওটার ব্যবস্থা করবেন।

আগের ঘটনাগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে তাঁরা এবার খুব সতর্কতার সাথে তাঁদের পরিকল্পনা সাজিয়েছেন। প্রথমত, তাঁদের কেউই অন্যজন যেদিকে লুকোবেন সেদিকে গুলি ছুঁড়বেন না। দ্বিতীয়ত, স্ট্যানলি যদি একটা কিংবা দুটো বাঘকে দেখেও ফেলেন, তবুও তিনি এন্ডারসনকে আসল খুনীটাকে মারার সুযোগ করে দেয়ার জন্য মানুষখেকোটা মড়ির দিকে না যাওয়া পর্যন্ত গুলি করা থেকে বিরত থাকবেন। এন্ডারসন গুলি করার সাথে সাথে তিনি দ্বিতীয় বাঘটাকে গুলি করবেন, অবশ্যই যদি সেটা তখনও তাঁর দৃষ্টিসীমায় থাকে। বাড়তি সতর্কতার কারণ, শেষ মুহূর্তে মারাত্মক কোনও ভুল থেকে রক্ষা পাওয়া। ডাক্তার যদি প্রথম গুলি করে বসেন তবে তিনি ভুল বাঘটাকে গুলি করে ফেলার একটা ভাল আশঙ্কা আছে, সেক্ষেত্রে মানুষখেকোটা পালিয়ে যাবে। মানুষখেকোটার কথা আগে চিন্তা করতে হচ্ছে, যদিও অন্য বাঘটাকেও তাঁরা মারতে চান। কিন্তু মানুষখেকোটাকে অবশ্যই প্রথমে মারতে হবে, কোনওভাবেই সেটাকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া যাবে না।

পুরো রাতটা না ঘুমিয়ে কাটানোর জন্য বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন এন্ডারসন। স্ট্যানলিকেও মোড়লের স্ত্রীর পিছনে রাতের একটা বড় অংশ নির্ঘুম কাটাতে হয়েছে, তবুও তাঁর অবস্থা এন্ডারসনের চেয়ে কিছুটা ভাল। কাজেই ঠিক হলো

খাওয়া ও ছোট্ট একটা ঘুম দেয়ার জন্য তিনি এখন ট্যাগার্থি ফিরে যাবেন। বেলা তিনটার দিকে বাড়তি খাবার, পানি, চা ও ডাক্তারের শটগানের ব্যারেলে লাগানোর একটা টর্চ নিয়ে তিনি এখানে ফিরে আসবেন।

এসময়ই এন্ডারসনের মাথায় বুদ্ধিটা আসল। ডাক্তারকে জানাতে তিনিও তার সাথে একমত হলেন। একটা কুঁড়ে থেকে পাটের একটা বস্তা নিয়ে তাঁরা হাঁটতে হাঁটতে প্রথম মড়িটার কাছে চলে আসলেন। এন্ডারসনের পরিকল্পনা অনুযায়ী এখান থেকে মড়ির সমস্ত উচ্ছিষ্ট সরিয়ে ফেলা হবে। কারণ কোনও একটা বা দুটো বাঘই যদি পুরনো মড়িটার কাছে ফিরে আসে, তবে তারা এখানে কিছুই খুঁজে পাবে না, যা তাদের দ্বিতীয় মড়িটার কাছে, যেখানে এন্ডারসনরা লুকিয়ে আছেন, সেই কুঁড়েগুলোর কাছে আসতে বাধ্য করবে।

তাদের পিছু পিছু আসা লোকগুলোকে হাড়গুলো বস্তার ভেতর ঢোকানোর কথা বলতেই তারা সভয়ে পিছিয়ে গেল। অতএব স্ট্যানলি আর এন্ডারসনকেই কাজে নেমে পড়তে হলো। স্ট্যানলি ডাক্তার, তাই তিনি এতে কিছু মনে করলেন না, কিন্তু এন্ডারসনের জন্য বিষয়টা রীতিমত কষ্টদায়ক ও অপ্রীতিকর।

চারদিকে ছড়িয়ে থাকা হাড়ের প্রতিটি টুকরো ও কণা সংগ্রহ করে তাঁরা থলেতে ভরে ফেললেন। যেহেতু সাথের কেউ এটা স্পর্শ করতে রাজি হলো না, এন্ডারসনকেই বস্তাটা কাঁধে নিয়ে ট্যাগার্থির দিকে যাত্রা করতে হলো।

হাড়গুলো থেকে বের হয়ে আসা প্রচণ্ড গন্ধ তাঁর নাকে এসে লাগছে, সেই সাথে অঝোর ধারায় ঝরছে নিজের শরীর নিসৃত ঘাম। পচা মাংস ও হাড়সহ আঠালো তরল পদার্থ মাঝে মাঝেই বস্তা থেকে চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে। স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়ির সামনে এসে তিনি যখন বস্তাটা ধপ করে নামিয়ে রাখলেন তখন তার হাত, কাঁধ ও গলায় বস্তা থেকে বের হওয়া এই আঠালো পদার্থ লেগে আছে। কর্তব্যরত কনস্টেবল বিস্মিত দৃষ্টিতে এন্ডারসনের দিকে তাকিয়ে থাকল।

ডাক্তারের ছোট কোয়ার্টারটাতে পৌঁছেই এন্ডারসন জোরে হাঁক দিয়ে স্ট্যানলির চাকর ছেলেটাকে এক গ্যালন চা বানানোর নির্দেশ দিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়লেন। দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকা কাপড়গুলো ছেড়ে, সেগুলো ভালভাবে ধুয়ে এবং চমৎকার একটা গোসল দিয়ে যখন বের হয়ে আসলেন তখন বেশ সুস্থ অনুভব করছেন।

গোসল শেষে লাঞ্চের আগে তিনি যখন কাপের পর কাপ চা ধ্বংস করে চলেছেন তখন ছেলেটা পরামর্শ দিল তার অন্তত লাঞ্চের জন্য পেটে কিছুটা জায়গা রাখা উচিত। কিন্তু এন্ডারসন যখন খাওয়া শেষ করে উঠলেন, টেবিলে সামান্য খাবারও অবশিষ্ট নেই। তিনি লক্ষ করলেন প্রচুর খাদ্য ধ্বংসকারী এক পেটুক হিসাবে চাকর ছেলেটা তাঁকে এখন রীতিমত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখছে।

তিনি ছেলেটাকে ডাক্তারের লাঞ্চটা এক পাশে রেখে তাঁদের দুজনের জন্য রাতের খাবার তৈরি করতে বললেন। এন্ডারসন এগুলো নিয়ে বেলা তিনটার দিকে কুঁড়ের দিকে রওয়ানা হবেন। জবাবে ছেলেটা হতাশ ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। তারপর সে রীতিমত মর্মাহত হয়ে জানাল, ডাক্তারের জন্য কোনও খাবার অবশিষ্ট নেই, কারণ তিনি একাই পুরো খাবার সাবাড় করে দিয়েছেন। কাজেই

এন্ডারসনকে লাঞ্চ ও সেই সাথে তাদের দুজনের ডিনার তৈরির জন্য কিছু টাকা তাকে দিতে হবে।

টাকা দিয়ে, দুপুর আড়াইটার দিকে জাগিয়ে দেবার কথা বলে বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন তিনি।

চাকরটা যখন তাঁকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল তখন প্রায় তিনটে বেজে গেছে। তবে ছেলেটা ইতিমধ্যে তাদের জন্য রান্না করা খাবারগুলো প্যাকেট করে ফেলেছে এবং দুই ফ্লাস্ক চা ও পানির দুটি ক্যান্টিন নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছে। এন্ডারসনকে এখন শুধু তাঁর রাইফেল ও পানির ক্যান্টিন দুটো কাঁধে ঝুলিয়ে এবং ডাক্তারের টর্চ ও খাবারের ওজনদার ঝোলাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে।

দ্রুত হেঁটে বেশ তাড়াতাড়িই তিনি কুঁড়েতে পৌঁছে গেলেন। ক্ষুৎ-পিপাসায় ইতিমধ্যে বেশ কাতর হয়ে পড়া ডাক্তার নতুন কোনও সংবাদ দিতে পারলেন না। স্ট্যানলি লাঞ্চ করার ফাঁকে তাঁরা তাঁদের পরিকল্পনাটা আবার ঝালাই করে নিলেন।

বেলা চারটের দিকে দুজন আলাদা হলেন। এন্ডারসন তাঁর রাইফেল, টর্চ, রাতের খাবার, এক ফ্লাস্ক চা ও পানির ক্যান্টিনটা সঙ্গে নিয়ে পাশের কুঁড়েটায় চলে আসলেন, যেখানে হতভাগ্য মহিলাটির বীভৎস দেহটা পড়ে আছে। লাশ থেকে যতটা সম্ভব দূরত্ব রেখে, কুঁড়ের বিপরীত প্রান্তে তিনি অবস্থান নিলেন। ভোর হওয়ার আগ পর্যন্ত চোদ্দ ঘণ্টার দীর্ঘ সময় কাটানোর প্রস্তুতি হিসাবে নিজের বসাটা যতটা সম্ভব আরামপ্রদ করে নেবার চেষ্টা করলেন তিনি।

এন্ডারসন এক পায়ের উপর আর এক পা আড়াআড়িভাবে রেখে কোনও ধরনের নড়াচড়া ও শব্দ না করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়ার অভ্যাস রপ্ত করেছেন অনেক আগেই, বন্যপ্রাণীর জন্যে অপেক্ষা করতে হলে এর কোনও বিকল্প নেই। একটু নড়াচড়া কিংবা সামান্যতম শব্দ বন্যপ্রাণী বা পাখিদের কাছে শিকারির উপস্থিতি প্রকাশ করে দেবে। শিকারি যে প্রাণীটার খোঁজে এসেছেন তার ঘ্রাণশক্তি তীব্র হয়ে থাকলে বাতাস কোন্ দিক থেকে প্রবাহিত হচ্ছে তাও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। বাতাসের গতি যত তীব্র হবে শিকারির গন্ধ তত দ্রুত প্রাণীটার কাছে পৌঁছে যাবে। আর এ কারণেই ভারতের হরিণ শিকারিরা জোর বাতাস বইছে এমন রাতে খুব কমই শিকারে বের হয়। বৃষ্টি শরীরের গন্ধ দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে বাধা দেয়, কিন্তু বাঘ ছাড়া বনের অন্য প্রায় সব প্রাণীই বৃষ্টির সময় নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়। এমনকী প্রবল বৃষ্টিপাতের সময় বাঘ ও হাতির পালগুলোকেও তাদের চলাফেরা সীমাবদ্ধ করে ফেলতে হয়।

তবে বাঘের ঘ্রাণশক্তি একেবারেই কম হওয়ায় এ মুহূর্তে এন্ডারসনকে এ বিষয়টা মোটেই ঝামেলায় ফেলবে না। তবে কোনও নড়াচড়া কিংবা শব্দের কারণে মানুষখেকোটা যেন তাঁর উপস্থিতি সম্পর্কে আগেই ধারণা পেয়ে না যায়। গত রাতের অভিযান এবং গত কয়েক দিনে যে পরিমাণ চমকের মুখোমুখি এগুলো হয়েছে তাতে ধরে নেয়া যায় দুটি বাঘই অত্যন্ত সতর্ক হয়ে গেছে। এটা আসলেই বিস্ময়কর যে একটা মানুষখেকো কীভাবে সহজাত প্রবৃত্তির বশে তার শিকার, আত্মরক্ষা করতে অক্ষম একজন সাধারণ মানুষের সাথে তার নিজের জীবন

ছিনিয়ে নিতে সক্ষম একজন শিকারীর পার্থক্য ধরে ফেলতে পারে।

সূর্যের তাপ থেকে আড়ালে থাকায় মৃতদেহটা এখনও গন্ধ ছড়াতে শুরু করেনি। চারপাশে সবকিছু একেবারেই শান্ত, কারণ মানুষখেকোটার ভয়ে ট্যাগার্থি ও তার আশপাশের গ্রামগুলোর রাখালেরা এখন গবাদিপশু জঙ্গলে চরাতে নিয়ে আসে না।

বিকালটা এক রকম নীরবেই কাটল। ব্যতিক্রম বলতে শুধু মাংসের উপর ডিম ফোটাতে ব্যস্ত মাছিদের গুঞ্জন। সন্ধ্যার অন্ধকার ইতিমধ্যে কুঁড়ের ভিতর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। একটু পরেই ভিতরটায় কিছু দেখা কষ্টকর হয়ে গেল। অবশ্য এন্ডারসন ঘরের বেড়ার নীচের প্রান্ত ও মেঝের মধ্যকার ফাঁকটা দিয়ে বাইরের বিদায় নিতে গড়িমসি করা আলোর দেখা পাচ্ছেন।

চিতাবাঘ ও অন্য সব বড় আকৃতির বনবিড়ালেরা সংখ্যায় কম থাকায়, এদের প্রিয় শিকার হিসাবে পরিচিত বনমোরগদের এদিকের জঙ্গলে প্রচুর সংখ্যায় দেখা যায়। তাদের আর সেই সঙ্গে ময়ূরের ডাক এন্ডারসনকে জানিয়ে দিল সূর্য অস্ত যাচ্ছে। কোনও শব্দ না করে সাবধানে রাতের খাবার সেরে ফেললেন এবং তারপর কয়েক ঢোক চা খেয়ে শরীরটা চাঙা করে নিলেন।

পাখিদের কণ্ঠ মিলিয়ে যেতেই কাছে একটা চিত্রলের দল ডাকতে শুরু করল। এন্ডারসনের কানে ভেসে আসল দূরাগত একটা সম্বরের পালের বিদায় সম্ভাষণ। প্রকৃতির এই সব আলামত ও পট-পরিবর্তন তাঁকে জানিয়ে দিল সূর্য অস্ত গেছে। কুঁড়ের ভিতর অন্ধকার এখন রীতিমত জাকিয়ে বসেছে।

শিগগিরই নাইটজারেরা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার জুড়ে দিল। উপত্যকার নীচের পাহাড়ী ছড়ায় একটা নাইট-হীরণ বিলাপ করতে শুরু করেছে, তখনই এন্ডারসন বুঝতে পারলেন জঙ্গলে সত্যিই রাত নেমেছে। তিনি এখন কুঁড়ের ভিতরে কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। মানুষখেকোটা যদি এখন আসে আর মড়িটা সরিয়ে নিতে শুরু করে, তবে বাধ্য হয়েই তাঁকে টর্চ জ্বালাতে হবে।

আর তখনই তিনি সমস্যাটার মুখোমুখি হবেন। এন্ডারসন যখন টর্চ জ্বালাবেন, ওটার আলো কুঁড়ের ভিতরের বেড়ায় পড়বে।

তারপর প্রতিফলিত হয়ে তার চোখে ফিরে আসবে। ফলে তাঁর পক্ষে বেড়া ও মেঝের ফাঁক দিয়ে বা এর বাইরে দেখা সম্ভব হবে না; অর্থাৎ মানুষখেকোটাকেই তিনি দেখতে পাবেন না।

চিন্তাটা এন্ডারসনকে অস্থির করে তুলল। তিনি তাঁর অবস্থান বদলানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি এখন কুঁড়ের ভিতর মড়িটার যে অংশ আছে, তার থেকে যতটা কাছে সম্ভব মেঝের উপর শুয়ে পড়তে পারেন। এটা তাঁকে বড় একটা সুবিধা দেবে। রাইফেলটা আগে থেকেই তাঁর সামনের মাটিতে প্রস্তুত করে রাখা, বাঘটা আসলে তাঁকে শুধু ব্যারেল ঘুরিয়ে ট্রিগার টিপতে হবে। মানুষখেকোটা কোনওভাবেই একটুও শব্দ না করে মড়িটাকে কুঁড়ে থেকে বের করে নিতে পারবে না, কারণ গতকালের তালগোল পাকানো অভিযানে একটা বাঁশের প্রান্ত স্ত্রী লোকটার মৃতদেহের মাংসের ভিতর বিঁধে যায় এবং বাঘটাকে মড়িটা নিয়ে যেতে হলে অবশ্যই এটাকে এই বাঁশ থেকে মুক্ত করতে হবে।

চায়ের ফ্লাস্ক ও রাইফেলটা সঙ্গে নিয়ে এন্ডারসন পেটে ভর দিয়ে খুব সাবধানে আস্তে আস্তে মড়িটার কাছে পৌঁছে গেলেন। তারপর এটার পাশেই শুয়ে পড়লেন। রাইফেলের বাঁটটা বগলের নীচে রেখে এটাকে এমনভাবে সামনের মেঝেতে শুইয়ে রাখলেন, রাইফেলটার ব্যারেলের শেষ প্রান্তের সাথে বেড়ার নীচের উন্মুক্ত অংশের ব্যবধান থাকল মাত্র কয়েক ইঞ্চি। এসময়ই এন্ডারসন তার কাঁধে ঠাণ্ডা, শক্ত কিছু একটার স্পর্শ পেলেন। এটা মড়ির পা, বোঝার সাথে সাথে তিনি মৃতদেহটা থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে সরে আসলেন।

দীর্ঘ তিনটে ঘণ্টা পার হয়ে গেল, কিন্তু বাঘের দেখা নেই। ইতিমধ্যে ঘড়ির কাঁটা দশের ঘর অতিক্রম করেছে। বাঘ সাধারণত রাত আটটার কাছাকাছি কোনও এক সময়ে মড়ির কাছে ফিরে আসে। চিতাবাঘ ফেরে আরও আগে। এন্ডারসন ভাবলেন মানুষখেকো আর তার সঙ্গী সম্ভবত আজ আর কুঁড়েমুখো হচ্ছে না। তখনই মড়ির পা আবার তার কাঁধ স্পর্শ করল।

তবে ঘটনাটা এখন আগের চেয়ে খারাপ। কারণ পা-টা এই মুহূর্তে বেশ ভাল ভাবেই নড়ছে, এটা এখন আর তাঁর কাঁধ ছুঁয়ে থেমে যাচ্ছে না; আস্তে-ধীরে সামনেও এগুচ্ছে।

তিনি কোনও শব্দই শুনতে পাননি, কিন্তু পা-টা আবার নড়ছে। আতঙ্কে তাঁর মাথার পিছনের চুলগুলো আপনাআপনিই দাঁড়িয়ে গেল। এন্ডারসন যখন আবার প্রাণ ফিরে পাওয়া বীভৎস ও ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহটা থেকে দ্রুত সরে পড়বার কথা ভাবছেন, তখনই তাঁর মধ্যে আবার স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি ফিরে আসল। আর সমাধানে পৌঁছে যেতেই উত্তেজনায় তাঁর শরীরটা কাঁপতে শুরু করল। সেই সাথে অবিরাম ধারায় ঘাম তাঁর মুখে নেমে আসছে। পা কিংবা তার মালিক জীবন ফিরে পায়নি, নিজের ক্ষমতায় নড়াচড়াও করছে না। মানুষখেকোটাই এটাকে নাড়িয়েছে।

এন্ডারসন কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। কাজেই রাইফেলের ব্যারেলটা সামনে ঠেলে দিয়ে অন্ধের মত গুলি করারও কোনও যৌক্তিকতা নেই। এটা কেবল ভয় পাইয়ে বাঘটাকে তাড়িয়ে দেবে। মানুষখেকোটা আবার কোথাও তার মরণ আঘাত হানবে। এন্ডারসন খুব বেশি হলে ওটাকে আহত করতে পারবেন যা ওটাকে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলবে। তাঁকে আগে নিশ্চিত হতে হবে কোথায় গুলি করছেন।

এসময় তিনি নখ আঁচড়ানোর মৃদ শব্দ শুনতে পেলেন। তাঁর ডান পাশে খুব কাছাকাছি কোথাও থেকে আসছে শব্দটা। তবে তিনি এখনও কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। টর্চ জ্বালাতে গিয়েও এন্ডারসন সিদ্ধান্ত বদলালেন, কারণ এখন টর্চ জ্বালালে ওটা তাকেই ধাঁধায় ফেলে দিতে পারে। এই মুহূর্তে তাঁর জন্য জরুরি হলো নখ আঁচড়ানোর শব্দটা কোথা থেকে আসছে এবং কে এটা করছে তা খুঁজে বের করা।

তারপরই এন্ডারসন বোকার মত একটা কাজ করে বসলেন। তিনি ভেবেছিলেন কোনও কিছু দেখতে না পেলেও চেষ্টা করলে আসলে কী ঘটছে তা অন্তত অনুমান করতে পারবেন। আর এটা মাথায় রেখেই তিনি তাঁর ডান হাতটা খুব ধীরে ধীরে আঁচড়ের শব্দ লক্ষ্য করে বাড়াতে লাগলেন।

তাঁকে বেশি দূর এগুতে হলো না, তাঁর আঙুলের মাথাটা পশমী ও বলিষ্ঠ কিছু একটাকে স্পর্শ করল এবং পর মুহূর্তেই চারদিকে নরক ভেঙে পড়ল। মানুষখেকোটা, সম্ভবত গতকাল মড়িটা বের করতে যে ঝামেলার মুখোমুখি হয়েছিল তা চিন্তা করে কিংবা মড়িটাকে আর একটু ভাল ভাবে আঁকড়ে ধরার চেষ্টায় তার থাবাটা বেড়ার নীচের ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দেয় এবং শক্ত কোনও অবলম্বনের জন্য হাতড়াতে শুরু করে। আর থাবার এই নড়াচড়ার সময়ই নখ আঁচড়ানোর শব্দটা হয়েছে, যা এন্ডারসন শুনতে পেয়েছেন। এবং তার আঙুল যখনই ওটার চামড়া স্পর্শ করল, অশরীরী আত্মাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ মানুষখেকোটা বুঝে গেল কুঁড়ের ভিতর জীবিত একটা কিছু আছে।

একটা সাধারণ বাঘ এ পরিস্থিতিতে নিঃসন্দেহে দ্রুত ছুটে পালিয়ে যেত। কিন্তু বেলানদারের এই বিভীষিকাটা সাধারণ কোনও বাঘ নয়। প্রথম থেকেই এটা অস্বাভাবিক আচরণ করে এসেছে। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। প্রচণ্ড শব্দে গর্জন করে উঠে চোয়াল দিয়ে বেড়ার প্রান্ত কামড়ে ধরল ওটা।

মানুষখেকোর এই অদ্ভুত আচরণ তাঁর কাজটা সহজ করে দিল। এন্ডারসনের সামনে বিশাল একটা গর্ত তৈরি হয়ে গেছে এবং তাঁর টর্চের আলোয় ভীতিপ্রদ একটা বাঘের চেহারা ভেসে উঠল, যার মুখে এখনও বেড়ার চূর্ণ-বিচূর্ণ অংশ লেখা আছে। মানুষখেকোটাকে রাইফেলের নলের মাত্র কয়েক ইঞ্চির মধ্যে পেয়ে গিয়ে এন্ডারসন আর দেরি করলেন না, .৪০৫ রাইফেল থেকে সরাসরি ওটার গলার উপরে গুলি করলেন। তারপর রাইফেলটা সহ গড়াতে গড়াতে বাঘটার কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে যেতে লাগলেন। তিনি যখন কুঁড়ের অন্য প্রান্তে পৌঁছে গেছেন, ততক্ষণে মানুষখেকোটা ফাঁকের ভিতর শরীরটা ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে। কিন্তু বাঘটা আর সামনে বাড়তে পারার আগেই তিনি সরাসরি ওটার মাথায় দুটো বুলেট ঢুকিয়ে দিলেন। মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকা প্রাণীটাকে এখানেই রেখে তিনি কুঁড়ের দরজার দিকে ছুটে গেলেন। এবং কবাট খুলে লাফ দিয়ে বাইরে বের হয়ে আসতেই আরও একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্যের মুখোমুখি হলেন।

এখানে আরও একটা বাঘ আছে, তাঁর থেকে মাত্র ফুট বিশেক দূরে এবং অন্য কুড়েটার এক প্রান্তে। তবে ওটা মাটিতে পড়ে আছে, এবং এখনও তার শরীর একটু একটু কাঁপছে। প্রায় পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে শটগানের গুলিতে স্ট্যানলি এটাকে মেরেছেন। তাঁর নিজের গুলির শব্দ আর প্রচণ্ড উত্তেজনার কারণে এন্ডারসন স্ট্যানলির গুলির শব্দ শুনতে পাননি।

একটু পর ডাক্তার এন্ডারসনকে জানালেন তিনি মানুষখেকোটার গর্জন এবং এর পরপরই এন্ডারসনের প্রথম গুলির শব্দ শুনতে পান। তারপরই কুঁড়ের বেড়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার শব্দ তাঁর কানে আসে। তাঁদের চুক্তির কথা ভুলে গিয়ে তিনি দৌড়ে বাইরে বের হয়ে আসেন, এবং দ্বিতীয় বাঘটাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েন। কয়েক গজ দূরে তাঁর দিকে পাশ ফিরে এটা তাঁর সঙ্গীকে দেখছে। নিশ্চিতভাবেই বাঘটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না এখন কী করা উচিত তার। সময় নষ্ট না করে স্ট্যানলি সরাসরি ওটার হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে শটগানের দুই ব্যারেল খালি করলেন। সাথে সাথেই ওটা মারা গেছে।

এন্ডারসনরা যেমন অনুমান করেছিলেন, মানুষখেকোটা একটা বাঘিনী, অপর বাঘটা তার পুরুষ সঙ্গী।

ভোর পর্যন্ত ট্যাগার্থিতে মানুষখেকোটার মৃত্যু উপলক্ষ্যে প্রচুর আনন্দ-উল্লাস চলল। পরের দিন বেলানদারে যখন সংবাদটা পৌঁছাল তখন গর্বে বুদ্ধিয়ার যেন আর মাটিতে পা পড়ছে না। সেই কি সবচেয়ে সেরা জাদুকর নয়? তার মন্ত্রই কি মানুষখেকোটার মৃত্যু ডেকে আনেনি? তবে বুদ্ধিয়া যে খুশি হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। ওঝা হিসাবে তার নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং ভবিষ্যতের অনাগত সব ভোজ ও উপঢৌকনের কথা চিন্তা করে সে আকণ্ঠ মদ পান করল। দুপুরে এন্ডারসন যখন তাকে ধন্যবাদ জানাতে গেলেন তখন সে মদের নেশায় বেহুঁশ।

জঙ্গলে অমঙ্গল

এন্ডারসনের আগের কাহিনিগুলো যারা পড়েছেন–তাঁদের কেউ কেউ হয়তো বা পট্টি নামটি স্মরণ করতে পারছেন। এন্ডারসন যাকে এক ধরনের গবাদিপশুর ক্যাম্প হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। পানপট্টিও এ ধরনের একটি ক্যাম্প। চিনার নদী যেখানে দক্ষিণ ভারতের বৃহত্তম নদী কাবেরীর সাথে মিশেছে তার থেকে ঠিক সাড়ে তিন মাইল দূরে চিনারের দক্ষিণ তীর ঘেঁষে এর অবস্থান। বর্ষা ও পরবর্তী দুই মাসই কেবল চিনার পানি বহন করে, বছরের বাকি সময়টা একে শুকনা নালা বই আর কিছু মনে হয় না। যদিও যেখানে এটা কাবেরীতে বিসর্জন দিয়েছে সেখান থেকে শুরু করে বেশ কিছুদূর পর্যন্ত এর দুই তীরই ঘন বনে আচ্ছাদিত। বাঁশ-ঝাড়, তেঁতুল, মাখি, ছোট গুল্ম, সব ধরনের উদ্ভিদেরই দেখা পাওয়া যায় এখানে।

মৌসুমী বায়ু বিদায় নেবার পর ভারতের প্রায় সব অঞ্চলেই গাছপালা দ্রুত শুকিয়ে যেতে শুরু করে। ধান, চোলাম, গম সহ বিভিন্ন ফসল ঘরে তোলার পর যে অবশিষ্ট গবাদিপশুরা খায় তা এসময় নিঃশেষ হয়ে যায়। বলা যায় এদের খাওয়ার মত কোনও কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। আর তখনই পশু মালিকদের চোখ পড়ে জঙ্গলের ওপর। যেখানে তখনও গুল্ম ও ঝোপ জাতীয় বিভিন্ন উদ্ভিদ সদর্পে অবস্থান করছে।

জঙ্গলে পশু চরানোর লাইসেন্স নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার বিনিময়ে বনবিভাগ থেকে কিনতে হয়। জঙ্গলের ভিতর এই পশুচারণ ভূমিতে আবার মৌসুমী বায়ু আগমনের আগে পর্যন্ত হাজার হাজার পশু চরে বেড়ায়। আর প্রতি বছর গ্রীষ্মে জঙ্গলের যেখানেই এমন পশুচারণ ভূমি গড়ে ওঠে সেখানে ক্যাম্প-সাইটও গড়ে ওঠে। দক্ষিণ ভারতে জঙ্গলের ভিতর এ ধরনের সাময়িক ক্যাম্প-সাইটগুলোই পট্টি নামে পরিচিত।

পানপট্টিটির অবস্থান সালেম জেলায়, বর্তমানে যা তামিলনাড়ু রাজ্যের অন্তর্গত। আগে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অধীনে থাকা ছোট্ট এই পট্টিটির কথা এর আশপাশের বিশ মাইল ব্যাসার্ধের এলাকার বাইরে খুব কম মানুষেরই জানা ছিল। এন্ডারসনের জানামতে পানপট্টিতে চমকে দেবার মত উত্তেজনাকর ঘটনা ঘটেছে মাত্র দু'বার। প্রথমবার এখানে উত্তেজনার জন্ম দেয় একটা পাগলা হাতি। একজন শিকারী সহ বেশ কয়েকজন মানুষকে মেরে এটা এ এলাকায় রীতিমত ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে।

এই ঘটনার পর বেশ কিছুদিন পানপট্টি একেবারে শান্ত ছিল। তারপর এই ছোট্ট ক্যাম্পে ঝড়ের মত আবির্ভাব ঘটে অতৃপ্ত ও প্রতিশোধের নেশায় উন্মত্ত এক আত্মার। আজ পাঠকদের এই গল্পই শোনাতে যাচ্ছি। জানিয়ে রাখা ভাল, ভয়ঙ্কর এই আত্মা কোনও মানুষের রূপ ধরে আসেনি, এসেছে ভয়ঙ্কর এক বাঘের রূপ ধরে। হঠাৎ করেই এখানে এর আগমন ঘটে, এবং তারপর আবার হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে যায়।

পানপট্টির বেশিরভাগ গবাদিপশুর মালিক ধনী ভূ-স্বামীরা; যাদের বেশিরভাগই

বাস করে পট্টি থেকে আঠারো মাইল দূরের ধর্মপুরী শহরে। অবশ্য দশ মাইল দূরবর্তী পেন্নাগ্রাম শহরেও কয়েকজন ভূ-স্বামী থাকে। তাদের গবাদিপশু দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে পেন্নাগ্রামের আশপাশের এলাকার কিছু নিম্নবর্ণের অধিবাসী ও জঙ্গলে বসবাসকারী বিশেষ এক আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোক, যারা 'পূজারী' নামে পরিচিত। জঙ্গলের মধ্যে খড়ের ছাউনি দেয়া ঘরে কিংবা চিনার নদীর ঢালে গর্ত করে এই পূজারীরা তাদের পরিবার নিয়ে বসবাস করে।

কাইয়ারা এমনই একজন পূজারী। অনেক বছর থেকেই সে নিয়মিত ভাবে গ্রীষ্মের সময় গবাদিপশু চরানোর দায়িত্ব পালন করে আসছে। অনেক দিন আগে সে যখন প্রথমবারের মত এ পেশায় যোগ দেয় তখন তার সাথে ছিল তার স্ত্রী ও একমাত্র মেয়ে মারদি। তারপর হঠাৎ করেই তার সংসারে বিপর্যয় নেমে আসে। প্রচণ্ড গরম এক রাতে, গলা ও শরীরের পিছনের অংশে সাদা ডোরা দেয়া কালো রঙের একটা সাপ, খড়ের ছাউনি দেয়া যে ঘরে কাইয়ারা ও তার পরিবার বাস করত সে ঘরে ঢুকে পড়ে। সাপটা পানি রাখার মাটির কলসিটার চারপাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ে। সন্দেহ নেই প্রচণ্ড গরমে অতিষ্ঠ প্রাণীটা পানি ভর্তি ঠাণ্ডা কলসিটা পেঁচিয়ে ধরে শরীরটাকে শীতল করার চেষ্টা করছিল।

এদিকে মাটিতে শুয়ে থাকা কাইয়ারার স্ত্রীর অবাধ্য চুলগুলো বারবারই তার নিজের মুখের উপর এসে পড়ছিল। কিছুটা বিরক্ত হয়ে সে সামনে ঝুঁকে পানির কলসীটার পাশে রাখা চুল বাঁধার কাপড়টা নেওয়ার জন্য হাত বাড়ায়। কিন্তু কাপড় মনে করে সে যে জিনিসটার দিকে হাত বাড়াল সেটা আসলে ছিল সাপ। আক্রান্ত হয়েছে মনে করে সাপটা সাথে সাথে ছোবল মারল। তার কবজির ঠিক উপরে এটার বিষদাঁত বিঁধে গেল। তারপর এটা পানির কলসীর পিছন থেকে বের হয়ে এসে বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কাইয়ারার স্ত্রী অস্পষ্টভাবে দেখল ঠাণ্ডা কালো রঙের কিছু একটা তাকে কামড় দিয়ে চলে গেছে। সে কাইয়ারাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে তার হাতের ক্ষতচিহ্ন দেখাল। স্ত্রীর হাতে আধ ইঞ্চি ব্যাসের খুদে দাগ দুটো দেখেই সে বুঝে ফেলল তাকে বিষাক্ত কোনও সাপে কেটেছে।

কাইয়ারা দ্রুততার সাথে কাজ শুরু করে দিল। আশপাশে আটাশ মাইলের মধ্যে কোনও ডাক্তার কিংবা হাসপাতাল কোনওটিই নেই। তার কালো ময়লা ব্যাগটাই এখন একমাত্র ভরসা, যার মধ্যে আছে ভেষজ উদ্ভিদের কিছু গুঁড়ো। ছুরি দিয়ে সাপ কামড়ানো রোগীর ক্ষতস্থান চেরা ও দূষিত রক্ত বের করে দেওয়ার মত সাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতিও তার অজানা। কাজেই সে দ্রুততার সাথে ঘরের বাইরে থেকে কিছু নরম গোবর নিয়ে আসল এবং ভেষজ উদ্ভিদের গুঁড়োর সাথে মিশিয়ে মিশ্রণটাকে তার স্ত্রীর ক্ষতস্থানের উপর পুরু করে লেপে দিল। তারপর বিড়বিড় করে একটা মন্ত্র বার বার আউড়াতে লাগল।

ত্রিশ মিনিটের মধ্যে তার স্ত্রীর কবজিতে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হলো। পরবর্তী ত্রিশ মিনিটের মধ্যে সে কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল। তার মুখ দিয়ে ইতিমধ্যে ফেনা বের হতে শুরু করেছে, শ্বাস-প্রশ্বাসও ভারী হয়ে এসেছে। সময় গড়ানোর সাথে তার শ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে লাগল। তার দেহের তাপমাত্রা কমতে শুরু

করল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে তার মৃত্যু হলো। কাইয়ারা তার মেয়ে মারদিকে নিয়ে একা হয়ে পড়ল। কত আর বয়স হবে মেয়েটার, তেরো কি চোদ্দো।

দেখতে দেখতে কয়েক বছর পার হয়ে গেল। মারদি ইতিমধ্যে সুস্বাস্থের অধিকারী, আকর্ষণীয় এক তরুণীতে পরিণত হয়েছে। অন্য আদিবাসী মেয়েদের তুলনায় সে যথেষ্ট স্মার্টও বটে। সে-ই এখন তার বাবার শেষ আশ্রয়। বাবার দেখাশোনা ও সংসারের কাজকর্ম সে-ই করে। ভোর হবার সাথে সাথে গবাদিপশুগুলোকে চরতে নিয়ে যাওয়া এবং সন্ধ্যায় চিনারের পশ্চিমের পাহাড়ের উপর সূর্য যখন আস্তে আস্তে ঢলে পড়ে তখন দুলকি চালে হেলে-দুলে চলতে থাকা গরুগুলোকে তাড়া দিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে আনার দায়িত্বও সে পালন করে নিষ্ঠার সাথে।

অনেক রাখাল ও পূজারীই কাইয়ারার কাছে তার মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে আসল। কিন্তু সবগুলো প্রস্তাবই তাচ্ছিল্যভরে ফিরিয়ে দিল মারদি। সে মনে করে সামান্য রাখাল কিংবা পূজারীর ঘরে যাবার জন্য তার জন্ম হয়নি।

এসময় একদিন পানপট্টিতে আগমন ঘটল সত্যনারায়ণের। তার বাবা গোপালস্বামী ধর্মপুরির একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও ভূ-স্বামী। তাঁর দুশোরও বেশি গবাদিপশু এ-মুহূর্তে পানপট্টিতে চরে বেড়াচ্ছে। সত্যনারায়ণ বিবাহিত, এবং তার একটি পুত্র সন্তানও আছে। বাবার গরু-মহিষের পাল পর্যবেক্ষণের জন্য সে একাই পট্টিতে এসেছে। সত্যনারায়ণ যখন পট্টিতে পৌঁছাল তখন বেলা ন'টা বেজে গেছে। গবাদিপশুর পালকে ইতিমধ্যে চরানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চিনারের উপত্যকা ও দুই তীরের ঢালের ঘন কুয়াশার চাদরকে অদৃশ্য করে দিয়ে এবং হাতি ও সম্বরের দলকে গহীন জঙ্গল ও পাহাড়ের দিকে ঠেলে দিয়ে চার মাইল পুবের মুতার পর্বতের পিছন থেকে যখন আলোক রশ্মি উঁকি দেয় তখনই প্রাণীগুলো জঙ্গলের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে।

গাড়িটাকে চালকের জিম্মায় রেখে সত্যনারায়ণ মূল রাস্তা থেকে জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়া সরু একটা রাস্তায় চলে এল। জঙ্গলের এই রাস্তা ধরে মাইল দুয়েক এগুলেই পৌঁছে যাওয়া যায় ক্যাম্পে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে কাইয়ারার ঘরের সামনে চলে আসল, আর জোরে কেশে উঠে তার উপস্থিতি জানান দিল। এরপর সে ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করল। সামান্য একজন কর্মচারীকে নাম ধরে ডাকাটা সে নিজের জন্য মর্যাদা হানিকর বলে মনে করত।

পূজারী আগেই তার মালিকের ছেলেকে আসতে দেখেছে। সে ঘরের নিচু দরজা দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে আসল এবং হাঁটু গেড়ে বসে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে তাকে প্রণাম করল।

'খবরাখবর কী?' প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল সত্যনারায়ণ।

'সব কিছু ঠিক আছে, স্বামী। ভগবানের কৃপায় আপনাদের একটি পশুও এবার জঙ্গলের ভয়ঙ্কর প্রাণীদের পেটে যায়নি। পা ও মুখের সংক্রমণেও এরা আক্রান্ত হয়নি। আমার ছোট মেয়েটা এগুলোকে জঙ্গলে চরতে নিয়ে গেছে,' জবাব দিল পূজারী।

কাইয়ারার উত্তর শুনেই সে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল এবং ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল. 'এভাবেই তা হলে তুমি তোমার জীবিকা অর্জন করছ? একটা ছোট মেয়ের

হাতে গবাদিপশুর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিজে ঘরে শুয়ে থাকো! এখন যদি একটা বন্যপ্রাণী পশুগুলোকে আক্রমণ করে বসে তবে মেয়েটা কী করবে?'

উপায়ান্তর না দেখে পূজারী জানাল সে অসুস্থ। সত্যনারায়ণ তার কথা বিশ্বাস না করে তাকে মিথ্যাবাদী বলে তিরস্কার করল। তারপর সে জানাল, যা হোক, সে নিজেই এখন গবাদিপশুগুলোর খোঁজ-খবর নিতে যাবে। সে যেন এখনই মেয়েটি যেখানে পশুগুলোকে চরাচ্ছে তাকে সেখানে নিয়ে যায়।

এভাবেই সত্যনারায়ণ প্রথমবারের মত মারদিকে দেখল। প্রথম দেখাতেই মেয়েটির অসাধারণ দেহ-সৌষ্ঠব ও সুন্দর চেহারা তাকে কামনার আগুনে দগ্ধ করল। তবে তখনই সে সরাসরি তার সাথে কথা বলল না। এটা তার জন্য মর্যাদাহানিকর হত, বিশেষ করে মেয়েটার বাবা যখন কাছেই দাঁড়িয়ে। সে একটা ভাল সুযোগের অপেক্ষায় থাকল।

সেদিনের পর থেকেই তার বাবার পশুর পালের প্রতি সত্যনারায়ণের মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহ দেখা গেল। যা আগে কখনও দেখা যায়নি। বিষয়টি তার বাবাকে অবাক করলেও তিনি তাকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি ধরে নিয়েছেন এটা তার একটা সাময়িক খেয়াল, কিছুদিন পরেই সে আগ্রহ হারাবে।

সত্যনারায়ণ তার পশুর পাল পরিদর্শনের সময়টা ইচ্ছা করেই একটু দেরিতে নির্ধারণ করত, যখন তার জানা মতে গবাদিপশুর পালকে চরানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, পট্টিতে না গিয়ে সে সরাসরি যেখানে পশু চরানো হয় সে জায়গাটায় চলে আসে। আর এভাবেই সে মারদির সাথে অনেকবার মিলিত হলো।

মারদির বয়স বেশি না হলেও, তার নারীসুলভ সহজাত জ্ঞান তাকে জানিয়ে দিল ছেলেটা তার প্রেমে পড়েছে। মারদির দৃষ্টি ছিল সব সময়ই অনেক উপরে, সাধারণ রাখাল ও পূজারীদের ধরাছোঁয়ার বাইরে, আর এখানেই রয়েছে তার স্বপ্নের উত্তর। অত্যন্ত ধনী এক যুবক; যে আবার তার মালিকের একমাত্র উত্তরাধিকার।

সত্যনারায়ণ তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনে খুব একটা সময় নিল না। জঙ্গল এক্ষেত্রে তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল এবং এক পর্যায়ে মারদি সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ল। তাদের ধারণা ছিল কেউই এই গোপন প্রণয়ের কথা জানে না। আসলে পট্টির কারুরই এটা অজানা ছিল না। রাখালরা কিছুটা দূর থেকে তাদের দেখত। অন্যদিকে পূজারীরা তাদের অলক্ষে তাদের অনুসরণ করে এবং জঙ্গলের ভিতর থেকে তাদের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলোও চাক্ষুষ করে।

এক সময় পূজারীদের মাধ্যমে ঘটনাটা কাইয়ারার কানেও পৌছাল। ভয়ে ও বিস্ময়ে রীতিমত বিহ্বল হয়ে পড়ল সে। তার মালিকের ছেলে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ, অন্যদিকে সে আর তার মেয়ে সবচেয়ে নিম্নবর্ণের হিন্দু। উপরন্তু ছেলেটা বিবাহিত এবং তার একটা সন্তানও আছে। এটা কী করে সম্ভব? এদিকে সে যদি সাহসী হয়ে সত্যনারায়ণের কাছে বিষয়টি জানাতে চায় তবে ঘটনাটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং তখন তার মালিক নিঃসন্দেহে তাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেবেন। কাজেই সে পুরো ঘটনাটা নিজের মনেই চেপে রাখল। যতদিন পর্যন্ত না তার মেয়ের শরীরে মাতৃত্বের সমস্ত লক্ষণ ফুটে উঠতে শুরু করল। এবার সে তার কাছে বিষয়টি জানতে চাইল।

তাকে বিস্মিত করে দিয়ে বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত না হয়েই মারদি তার অবৈধ প্রেম ও সন্তান ধারণের কথা স্বীকার করল এবং জানাল সত্যনারায়ণই বাচ্চাটার বাবা। সে দাবী করল সত্যনারায়ণ তাকে ভালবাসে এবং সে তাকে বিয়ে করার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পরবর্তী সাক্ষাতেই যথাসম্ভব বিনয়ের সাথে কাইয়ারা তার মালিক-পুত্রের কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করল।

সত্যনারায়ণ তীব্র ক্রোধে ফেটে পড়ল। প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ স্বরে সে বলতে লাগল, 'তুমি কী সব আবোল-তাবোল বকছ! আমি কী কারণে একটা নিম্নবর্ণের দুশ্চরিত্রা মেয়েলোকের সাথে সম্পর্ক করে নিজেকে অপবিত্র করব? কে তোমাকে এমন অসম্ভব গল্প শুনিয়েছে?'

'সে নিজেই আমাকে বলেছে,' অনুচ্চ স্বরে জবাব দিল পূজারী।

ভ্রু কুঁচকে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকল সত্যনারায়ণ। আর কিছু বলল না সে। তারপর ঘুরে হাঁটতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

পরদিন সকালে মারদি যথারীতি জঙ্গলে গবাদিপশু চরাতে নিয়ে গেল। গত রাতে সে এক ফোঁটা ঘুমায়নি। তার চোখের নীচে কালচে দাগ পড়ে গেছে এবং চোখ টকটকে লাল বর্ণ ধারণ করেছে। সন্দেহ নেই প্রচুর কান্নাকাটি করেছে। সম্ভবত তার বাবা তাকে জানিয়েছে, সত্যনারায়ণ তাকে স্পর্শ করার কথা অস্বীকার করেছে এবং তাকে একটা দুশ্চরিত্রা বাজে মেয়েছেলে বলে গালি দিয়েছে।

সেদিন সূর্যাস্তের অনেক পর একটা দুটো করে বিশৃঙ্খলভাবে গরুগুলোকে পট্টিতে ফিরতে দেখা গেল। কোনও কোনওটা ফিরলও না। সেই সাথে মারদিরও কোনও হদিস নেই।

অন্ধকার হওয়ার পরেও মেয়েকে ফিরে আসতে না দেখে কাইয়ারা চিন্তিত হয়ে পড়ল। মেয়েটার খোঁজে তার সঙ্গে যাবার জন্য সে পট্টির অন্যদের অনুরোধ করতে লাগল। কেউ কেউ তার সাথে যেতে সম্মত হলো, আবার কেউ বা তাকে বিমুখ করল।

পট্টিতে একটাও লণ্ঠন ছিল না। কারও কাছে একটা টর্চও নেই। পট্টির কুঁড়েগুলোয় আলো জ্বলে ছোট এক ধরনের তেলের বাতি থেকে। মাটির পাত্রে তেলে ভাসমান একটা সলতেতে আগুন ধরিয়ে এ বাতিগুলো তৈরি করা হয়। বাইরে এক ফোঁটা চাঁদের আলোও নেই, কারণ সেদিন ছিল অমাবস্যা। উপরন্তু এটা ছিল রাতের সবচেয়ে অশুভ ও ভয়ঙ্কর সময়। এসময়ই সব ধরনের অপশক্তিরা চলাফেরা শুরু করে; অশুভ আত্মারা মানুষ, বাঘ, হাতী ও অন্য কোনও বন্যপ্রাণী কিংবা আকাশ ছোঁয়া থামের আকৃতি নিয়ে আবির্ভূত হয়। তীক্ষ্ণ ও কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে, অশুভ স্বরে হাসতে হাসতে তারা অসহায় শিকারের পিছু নেয়।

এমনই এক আতঙ্কজনক পরিবেশে ছোট্ট দলটা মারদির খোঁজে বের হলো। প্রতিদিন যে পথে পট্টির পশুর পালকে জঙ্গলে চরাতে নিয়ে যাওয়া হয় সে পথ ধরেই তারা এগোল। গাছের পাতার দুর্ভেদ্য আচ্ছাদনের ফাঁক দিয়ে একটা-দুটো তারা উঁকি দিচ্ছে। যদিও তা জঙ্গলের কালিগোলা অন্ধকারকে বিন্দুমাত্র দূর করতে পারছে না। হয়তো বা ভয়ঙ্কর কোনও অপদেবতা সামনের গাছটার পিছনে কিংবা কাছের ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। যে-কোনও সময় এটা আঘাত হানবে। হয়তো বা এ

মুহূর্তে জঙ্গলের কোনও অন্ধকার কোণে তাদের জন্যই ওত পেতে বসে আছে ভয়ঙ্কর কোনও মানুষখেকো বাঘ কিংবা চিতা, এমনই কালিগোলা অন্ধকার যে তাদের বিন্দুমাত্র জানান না দিয়ে ক্রোধোন্মত্ত কোনও পাগলা হাতিও তাদের তিন ফুটের মধ্যে চলে আসতে পারবে।

জঙ্গলের সরু রাস্তা ধরে একজনের পাশে একজন করে গুচ্ছবদ্ধভাবে দলটা এগুচ্ছে। ফলে রাস্তার কিনারা ঘেঁষে এগুনো লোকগুলোর দেহের সাথে পথের দু'পাশের কাঁটা ঝোপের সংঘর্ষে বেশ জোরাল শব্দ হচ্ছে। তাদের শরীরের চামড়াও ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে কাঁটার আঘাতে। কিন্তু তারপরও তারা কেউই লাইনের শেষে থাকতে রাজি নয়।

সাধারণভাবে ধরে নেয়া হয় দলের শেষ সদস্যটিই বাঘ, চিতাবাঘ কিংবা হাতির শিকারে পরিণত হবে। সেক্ষেত্রে তার আর্তনাদে অন্যদের সতর্ক হওয়ার এবং পালানোর একটা সুযোগ থাকে। কিন্তু যদি একটা পিশাচ তাকে আক্রমণ করে, তবে কোনও ধরনের সতর্ক-সংকেত না দিয়েই সে অদৃশ্য হয়ে যাবে। দলের অন্য কেউ তার অন্তর্ধানের বিষয়টি এমনকী জানতে পর্যন্ত পারবে না। তারপর তার পরের লোকটা অদৃশ্য হবে, তারপর এর পরের জন– এভাবে চলতেই থাকবে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগে এক সময় পুরো দলটাই অদৃশ্য হয়ে যাবে।

এভাবেই একজনের পাশাপাশি আরেকজন করে তারা এগুতে লাগল এবং এক সময় দলটা দাঁড়িয়ে পড়ল। দলের প্রতিটি সদস্যের মনেই অজানা একটা ভয় মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল। দাঁড়িয়ে পড়বার সেটাই কারণ। পূজারী তার মেয়ের নাম ধরে ডাক দিল। 'মারদি!' 'মারদি!' বলে সে ডাকতেই লাগল।

কিন্তু নীচের উপত্যকা থেকে ভেসে আসা বাতাসের তীক্ষ্ণ শিস্ দেওয়ার মত শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দই তাদের কানে পৌঁছাল না। তারপরেই বেশ দূরের জঙ্গলে একটা বাঘ গর্জে উঠল। কিছুটা দূরত্বে একটা হাতির কানে শব্দটা পৌঁছার সাথে সাথে ক্রুদ্ধ স্বরে ডেকে উঠে বাঘটার চ্যালেঞ্জের জবাব দিল সে। চিনারের অন্য তীরে একটা সম্বর মানুষের উপস্থিতি টের পেয়ে ডাকতে শুরু করল। পর্বতের উপরের দিকে একটা লেঙ্গুর বিরক্তিকর শব্দে জেগে উঠল এবং দলের অন্য সদস্যদের উদ্দেশে একটার পর একটা সতর্ক সংকেত দিয়ে যেতে লাগল। অনুসন্ধানকারী দলটি এখানে আর অপেক্ষা করা সমীচীন মনে করল না। তারা দ্রুত পট্টির দিকে ফিরে চলল। সৌভাগ্যক্রমে কোনও ধরনের দুর্ঘটনা ছাড়াই তারা পট্টিতে ফিরে আসতে পারল।

যেহেতু মেয়েটা দিনের আলোয় নিখোঁজ হয়েছে, সবাই ধরে নিল তাকে নিশ্চয়ই বাঘে ধরে নিয়ে গেছে। মেয়েটাকে যদি হাতি কিংবা চিতাবাঘে মেরে থাকে তা হলে নিঃসন্দেহে কোনও না কোনও চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যেত। কিন্তু কাইয়ারা ও পট্টির অন্যরা সাতদিন ধরে আশপাশের জঙ্গলে তন্নতন্ন করে খুঁজেও মেয়েটার কোনও চিহ্ন পেল না।

তারপরই একটা সূত্র আবিষ্কৃত হলো। সূত্রের উৎস একজন গাড়োয়ান। ঘটনার দিন জঙ্গল থেকে পেন্না গ্রামের দিকে চলে যাওয়া রাস্তার ঢালু অংশটা দিয়ে গাড়ি ওঠাতে সে যখন হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল তখনই পিছন থেকে একটা বড় প্রাইভেট কার তার গাড়িটাকে ওভারটেক করার চেষ্টা করলে সে গাড়ি সহ রাস্তার পাশের নর্দমাতে

পড়ে যায়। ঢালের কারণে এ রাস্তাটা অতিক্রমের সময় বেশিরভাগ গাড়োয়ানই ষাঁড়ের বদলে মোষ ব্যবহার করে। মোষ ষাঁড়ের তুলনায় কষ্ট সহিষ্ণু এবং একগুঁয়ে। এরা যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের সাথে পা ফেলে। অবশ্য মোষের একটা সমস্যাও আছে– দুর্ভাগ্যজনকভাবে এরা ষাঁড়ের তুলনায় স্থূল বুদ্ধির। যখন প্রাইভেট কারটা মোষের গাড়িটার ঠিক পিছনে চলে আসে তখনও হর্ন বাজতে না দেখে গাড়োয়ান লোকটা রীতিমত বিস্মিত হলো। শুধু তাই নয়, তাকে কিছু বুঝতে না দিয়েই ড্রাইভার তার গাড়িটাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করল। এদিকে আচমকা পিছন থেকে একটা কারকে উদয় হতে দেখে আতঙ্কিত মোষগুলো রাস্তার পাশের নর্দমার দিকে নামতে শুরু করে এবং বাঁশ ভর্তি পুরো গাড়িটাকেই উল্টে দেয়। সৌভাগ্যক্রমে গাড়োয়ান লোকটা নিরাপদ জায়গায় উড়ে এসে পড়ে। তবে মাটিতে পড়ার আগেই এই অসভ্য লোকটাকে দেখে নেয়ার জন্য সে প্রাইভেট কারটার দিকে তাকায়।

গাড়িটা সত্যনারায়ণের। গাড়োয়ান আগেও এই গাড়িটা দেখেছে। কেউ একজন গাড়িটা চালাচ্ছিল, তবে সে সত্যনারায়ণকে পিছনের সিটে বসে থাকতে দেখে। সত্যনারায়ণ একটা মেয়েকে হাত দিয়ে ধরে রেখেছে। গাড়িটা দ্রুত গতিতে অতিক্রম করে যাবার সময় পলকের জন্য মেয়েটার পরনের লাল শাড়িটা দেখতে পায় গাড়োয়ান। সে আরও জানায়, সে মেয়েটাকে চিনতে পারেনি। কিন্তু পট্টির লোকরা জানে নিখোঁজ হবার সময় মারদি লাল রঙের একটা শাড়িই পরে ছিল। পুরো ধাঁধাটা যেন এবার খাপে খাপে মিলতে শুরু করল।

সাধারণভাবে যে কেউ আশা করতে পারে সকালের প্রথম ভাগে মুতার ট্র্যাক জনশূন্য থাকবে। এসময় গাড়োয়ানের উপস্থিতি ছিল সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। কারাদিযেদু (ভাল্লুকের খাদ্য) নামের পাথুরে টিলাটাকে ঘিরে পাক খাবার সময় রাস্তাটা যেখানে বাঁক খেয়েছে সেখানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে যে কেউ সংক্ষিপ্ত পথে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বিশ মিনিটের মধ্যে মারদি যেখানে পশুগুলো চরাত সেখানে পৌছে যেতে পারবে।

পুরো ঘটনাটা পর্যালোচনা করলে সম্ভাব্য দুটি উপসংহারে পৌছানো যায়। হয় প্রেমিক-প্রেমিকাদ্বয় আগে থেকেই মিলিত হবার সিদ্ধান্ত নেয় এবং এই সুযোগে সত্যনারায়ণ তাকে অপহরণ করে, কিংবা মেয়েটার অগোচরে গোপনে সে তার কাছে পৌছে যায় এবং তারপর জোর করে ধরে নিয়ে যায়। তবে যেভাবেই মেয়েটাকে অপহরণ করা হোক না কেন, এরই মধ্যে নিশ্চয়ই তাকে মেরে ফেলা হয়েছে।

কাইয়ারা তার বিশ্বস্ত দুই-একজন সঙ্গীর সহায়তায় পুরো ঘটনাটাই জানতে পারল। কিন্তু খোলাখুলি ভাবে এটা প্রকাশ করতে সাহস করল না। কারণ চারদিকেই চরেরা ছড়িয়ে আছে। কোনওভাবে যদি তাদের মাধ্যমে সত্যনারায়ণ কিংবা তার বাবা জানতে পারে, সে তাদের বিরুদ্ধে এসব বলে বেড়াচ্ছে তবে আর রক্ষা নেই। সেক্ষেত্রে সে যে চাকরিচ্যুত হবে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এমনকী ভাড়াটে গুণ্ডা লাগিয়ে তাকে হত্যাও করতে পারে। ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা তাকে পরামর্শ দিল পুরো বিষয়টা ভগবানের হাতে ছেড়ে দিয়ে সে যেন এটা ভুলে থাকার চেষ্টা করে।

কিন্তু সে একজন বাবা। উপরন্তু পানপট্টির রাখাল ও অন্য পূজারীদের কাছে অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারী একজন ব্ল্যাক ম্যাজিশিয়ান হিসাবে তার বেশ সুখ্যাতি

আছে। এখন যদি সে তার ক্ষমতা দেখাতে না পারে তবে একজন ক্ষমতাশালী কালো জাদুকর হিসাবে তার সুখ্যাতি নিঃসন্দেহে ভূলুণ্ঠিত হবে। তারা বলাবলি করবে যে নিজেকে একজন কালো জাদুকর বলে দাবী করে, এখন তার ক্ষমতা কোথায় গেল?

কাইয়ারার আশঙ্কা একেবারে অমূলক নয়, কারণ পট্টির সবাই-ই বুঝতে পেরেছে মেয়েটার ভাগ্যে আসলে কী ঘটেছে; যদিও ভয়ে তারা কেউ এ ব্যাপারে খোলাখুলি আলোচনা করেনি।

বেশ কিছুদিন পরের ঘটনা। আবার এসেছে সেই অমাবস্যার রাত। মাসের অন্ধকারতম এই রাতেই অতৃপ্ত প্রেতাত্মারা বেরিয়ে পড়ে শিকারের খোঁজে আর জাদুকরেরা প্রয়োগ করে তাদের সবচেয়ে ক্ষমতাধর জাদু।

সন্ধ্যায় খাবার আয়োজন সমাপ্ত করে রাতের মত কুঁড়েতে ঢোকার আগে পট্টির বাসিন্দারা মৃদুভাবে জ্বলতে থাকা আগুনের কুণ্ডলীটিকে ঘিরে আড্ডা জমিয়েছে। এসময় কাইয়ারার আবির্ভাব ঘটল সেখানে। হাঁটতে হাঁটতে সে তাদের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়াল। বিশেষ কোনও কিছুর জন্য সে পুরোপুরি সজ্জিত হয়ে এসেছে। লাল আর সাদা অলঙ্করণ তার মুখটাকে ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। ডান হাতের কনুইয়ের উপর জড়ানো বন্ধনী একজন কালো জাদুকর হিসাবে তার মর্যাদা প্রকাশ করছে। উদারারাচামনি গাছের কাঁটাযুক্ত চারা দিয়ে তৈরি বিশেষ একটা হার ঝুলিয়েছে সে তার গলায়। সেই সাথে ঝুলছে কালো রঙের ভয়ঙ্কর চেহারার বিশাল একটা জপমালা।

খুক খুক শব্দে কেশে গলাটা পরিষ্কার করে সে তার সাথীদের উদ্দেশে বলতে শুরু করল, 'ভাইয়েরা, তোমরা সবাই জানো যে দুষ্ট প্রকৃতির একজন লোক আমার মেয়ের সাথে প্রতারণা করেছে। শুধু তাই নয়, সে তাকে অপহরণ করেছে এবং সম্ভবত হত্যা করেছে। আমরা দুর্বল ও গরীব। অন্যদিকে দুষ্কৃতকারীরা অত্যন্ত ধনী। ফলে আমরা কারও কাছে এর প্রতিকার চাইতে পারিনি। কেউ আমাদের সাহায্যে একটা আঙুলও তোলেনি। তবে আমার এমন একটা ক্ষমতা আছে যা তাদের নেই। এটা এমন এক ক্ষমতা যা অপরাধী আর তার পুরো পরিবারকে ধ্বংস করবে এবং মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে।'

পূজারী বলতেই থাকল, 'আমি এখন আমার আদরের মেয়ের খোঁজে বের হচ্ছি। হয়তো বা আমি তাকে খুঁজে পাব, কিংবা পাব না। হয়তো বা আমি নিজেই আর সেখান থেকে ফিরে আসব না। কিন্তু তোমাদের সাক্ষী রেখে আমি বলতে চাই যদি এই পাপিষ্ঠের হাতে আমার কোনও ক্ষতি হয়, তবে আমি এখন তাকে আর তার পরিবারকে অভিশাপ দিলাম। আমার আর আমার মেয়ের জীবনের বদলা হিসাবে সে আর তার প্রিয়জনদের জীবনও ধ্বংস হবে।'

তারপর সে পর পর তিনবার বলল, 'আমি তাকে অভিশাপ দিলাম। আমি তাকে অভিশাপ দিলাম। আমি তাকে অভিশাপ দিলাম।' তারপর সে জানাল পর পর তিনবার এই অভিশাপের ফলে সে যা বলেছে তা-ই ঘটবে।

পরের দিন সকালেই কাইয়ারী পট্টি ত্যাগ করল। সে আর ফিরে আসেনি। কেউ তাকে সেদিনের পর আর দেখেওনি। এক সময় রাখালরা তার কথা ভুলে গেল। কেবল তার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন সাথী তার কথা মনে করে দুঃখ পেল। তারা ভাবল, পূজারী আসলেই খুব বোকা, না হলে কি কেউ জেনে-শুনে বাঘের মুখে মাথা দেয়।

ছয় মাস পার হয়ে গেল। পুরো পট্টি পঙ্গাল উৎসবে মেতে উঠল। গ্রামের গরু-মোষগুলোর শিং লাল, নীল, সবুজ ও উজ্জ্বল হলুদ রঙে বর্ণিল হয়ে উঠল। এগুলোর কপালও সাজানো হয়েছে লাল ও সাদা রঙের আল্পনায়। নানা রকম খেলারও আয়োজন করা হলো। বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে থাকল মানুষের সাথে ষাঁড়ের লড়াই।

সত্যনারায়ণ স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে তার বাবার সাথে এই উৎসবে যোগ দিতে আসল। প্রধান সড়কে ড্রাইভারের জিম্মায় বরাবরের মত গাড়িটা রেখে এসে তারা ট্রেইল ধরে পট্টির উদ্দেশে রওনা হলো।

অবশ্য পঙ্গাল উৎসবে যোগ দেবার পুরো পরিকল্পনাটাই সত্যনারায়ণের বাবার। সত্যনারায়ণ কোনওভাবেই পানপট্টিতে ফিরে আসতে চায়নি। এ জায়গাটা তার জন্য শুধু যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতিই বয়ে এনেছে। ওই বাজে পূজারী মেয়েটা তাকে ভালভাবেই পেয়ে বসেছিল। তাকে বিয়ে করবে বলে সে মেয়েটাকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা-ও বোকা মেয়েটা বিশ্বাস করে ফেলে। পরিস্থিতি আরও খারাপ করে দিয়ে মেয়েটা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। এই প্রেমের কারণেই তার এক হাজার রূপী খরচ হয়েছে, যা গাড়ির ড্রাইভার দাসকে মুখ বন্ধ রাখার জন্য দিতে হয়েছে। অবশ্য ড্রাইভার বেটা জানে না মেয়েটার দেহ নিয়ে সে কী করেছে। ঘটনার কোনও সাক্ষী যেন না থাকে, সেজন্য সে তখন ড্রাইভারকে কিছু সময়ের জন্য গাড়ি থেকে সরিয়ে দেয়।

তবে ঘটনাটা এখানেই শেষ হয়নি। মেয়েটার খোঁজে তার বাবা তাদের ধর্মপুরীর বাড়িতে এসে হাজির হয়। সৌভাগ্যক্রমে সত্যনারায়ণের বাবা তার আগের দিনই একটা কাজে মাদ্রাজ চলে যান। এই ঘটনার ফল হিসাবে তার পকেট থেকে আরও এক হাজার রূপী ঝরে যায়। এবার অবশ্য দাস পুরো ঘটনাটাই জানল। সত্যি কথা বলতে কী, সে-ই মৃতদেহটাকে গাড়িতে তোলে। তারপর সত্যনারায়ণ আর দাস মিলে মৃতদেহটাকে পাথর বেঁধে ভারী করে চল্লিশ মাইল দূরের সালেমের দিকে চলে যাওয়া রাস্তার পাশের একটা বড় দীঘিতে ফেলে দেয়।

আর এ সব কিছুর একটাই অর্থ, ড্রাইভার ব্যাটা অনেক বেশি জেনে ফেলেছে। গত সপ্তাহেই সে তার কাছে পাঁচশো রূপী দাবী করে। সত্যনারায়ণ তাকে টাকা দিতে সরাসরি অস্বীকৃতি জানাতে গিয়েও পারেনি, কারণ ড্রাইভারের মুখের চাপা হাসি তাকে পিছনের ঘটনাগুলো মনে করিয়ে দেয়।

তখনই সত্যনারায়ণ একটি পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলে। পঙ্গাল উৎসবের পর পরই সে একটা বড় শিকার অভিযানে বের হবে। এই অভিযানে সে তার গাড়িচালক দাসকেও সঙ্গে নেবে এবং শিকার অভিযানের এক পর্যায়ে দুর্ঘটনাবশত দাস তার গুলিতে নিহত হবে। নিশ্চিতভাবেই বিষয়টা নিয়ে পুলিশ অনেক খোঁচাখুঁচি করবে। তবে তার বিশ্বাস বাবা কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে তাদের মুখ বন্ধ করে দিতে সমর্থ হবে।

কিন্তু এ মুহূর্তে এত জায়গা থাকতে পঙ্গাল উৎসবে যোগ দিতে তাকে আবার পানপট্টিতেই যেতে হচ্ছে। সত্যনারায়ণ অবশ্য তার বাবাকে এখানে আসা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কে না জানে বুড়ো মানুষেরা একটু একগুঁয়ে স্বভাবের হয়ে থাকে। তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। কাজেই দাসকে গাড়ির কাছে

রেখে তারা চারজন এখন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পট্টির দিকে চলেছে। পট্টির দিকে রওয়ানা দেবার সময় দাস তাকে আরও একবার তার সেই গা জ্বালা ধরানো হাসিটা উপহার দিল। সেই সাথে সত্যনারায়ণ আরও একবার স্মরণ করল যত দ্রুত সম্ভব তাকে শিকার অভিযান আর সেই সূত্রে দাসের দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর ব্যবস্থাটা করে ফেলতে হবে। দাস ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে।

চারজনের অভিযাত্রী দলটা পট্টিতে পৌঁছে দেখল রাখাল আর পূজারীরা তাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য অপেক্ষা করছে। প্রথমেই তারা তাদের মালিক ও অন্যদের ডাবের পানি এবং এর ভিতরের নরম শাঁস দিয়ে আপ্যায়িত করল। তারপরই রঙচঙে ও জাঁকাল সাজে সজ্জিত ষাঁড়গুলোকে তাদের সামনে হাজির করা হলো। তাদের মনোরঞ্জনের জন্যে দু'দফা ষাঁড় ও মানুষের লড়াইও প্রদর্শিত হলো। তবে ষাঁড়গুলো বাঁধা থাকায় এবং দুই দিক থেকে ছয়জন মানুষ টেনে ধরে রাখায় লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারীরা ছাড়া অন্য কাউকে লড়াইটা আতঙ্কিত কিংবা বিস্মিত করতে পারল না।

এসব উৎসব উদযাপন করতে করতে সন্ধ্যা পার হয়ে গেল। আবারও ডাবের মিষ্টি পানি পান করে অতিথিরা পট্টি ত্যাগের প্রস্তুতি নিল। কিন্তু পট্টির রাখালেরা এ এলাকায় বর্তমানে কোনও হাতীর পাল অবস্থান করছে না বলে নিশ্চিত করায় তারা আরও কিছুটা সময় এখানে হেলা ফেলায় কাটিয়ে দিল। চিনারের পশ্চিমের পাহাড়গুলোর আড়ালে ইতিমধ্যে সূর্য অদৃশ্য হতে শুরু করেছে। তবে অতিথিদের এ নিয়ে মোটেই চিন্তিত মনে হলো না। কারণ স্বাভাবিক ভাবে হেঁটে গেলেও তারা অন্ধকার নামার আগেই গাড়ির কাছে পৌঁছে যেতে পারবে।

ঘটনাটা ঘটল পট্টি আর মূল সড়কের মাঝামাঝি কোনও জায়গায়। সত্যনারায়ণ আর তার বাবা কোনও একটা বিষয়ে আলাপ করতে করতে আগে আগে এগুচ্ছিল। সত্যনারায়ণের স্ত্রী একজন আদর্শ ভারতীয় রমণীর মতই বাচ্চাটার হাত ধরে কিছুটা দূরত্ব রেখে তাদের পিছন পিছন এগুচ্ছে। এদিকে পুরো দিন জুড়ে চলা আনুষ্ঠানিকতায় ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত বাচ্চাটা কাঁদতে শুরু করেছে।

মানুষ কিংবা অন্য যে-কোনও প্রাণীর বাচ্চাদের জন্যই জঙ্গলে শব্দ করে কাঁদা বিপজ্জনক। জঙ্গলের আইনে ছোট কিংবা অসহায়দের প্রতি করুণার কোনও সুযোগ নেই। এখানে যে শক্তিশালী তারই শুধু টিকে থাকার অধিকার আছে।

হঠাৎ করেই একটা ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল। তারপরই কালোডোরার হলদেটে একটা শরীর যেন শূন্য থেকে আবির্ভূত হলো এবং এটা কাঁদতে থাকা বাচ্চাটাকে আক্রমণ করল। এদিকে প্রাণপ্রিয় বাচ্চাটাকে আক্রান্ত হতে দেখে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য মা বাঘটার মাথার উপর নিজেকে ছুঁড়ে দিল। বাঘটার ক্রুদ্ধ গর্জন ও চারদিকে একটা তোলপাড়ের শব্দ সামনের দুজনের কানেও পৌঁছাল। পিছন ফিরতেই তারা দেখতে পেল বাচ্চাটাকে মুখে নিয়ে বাঘটা পিছনের পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং সামনের থাবার সাহায্যে মহিলাটাকে আক্রমণ করছে। তারা এর বেশি কিছু দেখার জন্য অপেক্ষা করল না।

বয়সে তরুণ সত্যনারায়ণ সহজেই তার বাবাকে দৌড় প্রতিযোগিতায় পরাজিত করল এবং আগে গাড়ির কাছে পৌঁছাল, কিছুটা সময় পর তার বাবাও হাঁপাতে

হাঁপাতে সেখানে পৌছাল, অবশ্য এই পথ পাড়ি দিতে তাকে বেশ কয়েকবার আছাড় খেতে হয়েছে।

সাহায্যের আশায় দাস প্রচণ্ড গতিতে গাড়িটাকে পেন্নাগ্রামের উদ্দেশে উড়িয়ে নিয়ে চলল। কিন্তু তখনই তারা সাহায্য নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌছাতে পারল না, কারণ ইতিমধ্যে চারদিক অন্ধকারের চাদরে ঢাকা পড়ে গেছে।

পরের দিন সকালে উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বেশ বড় একটা সাহায্যকারী দল দুর্ঘটনাস্থলে পৌছাল। মা ও ছেলে দু'জনকে তারা এক গজ ব্যবধানে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখল। বাঘের ধারাল দাঁতের আঘাতে ছোট ছেলেটার পুরো শরীর ফালাফালা হয়ে গেছে। অন্যদিকে ছেলেকে বাঁচাতে বাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া সত্যনারায়ণের স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে বাঘের থাবার আঘাতে। তবে আশ্চর্যজনক ঘটনা হলো, একটা মৃতদেহ থেকেও বাঘটা এক টুকরো মাংস খায়নি, আশপাশের শক্ত মাটিতে বাঘটার কোনও পায়ের ছাপও খুঁজে পাওয়া গেল না।

আকস্মিক এই দুর্ঘটনা সবাইকে বিস্মিত করল। কারণ আশপাশে একশো বর্গমাইলের মধ্যে কোনও মানুষখেকো বাঘ কিংবা চিতাবাঘের খবর কারুরই কানে আসেনি। পানপট্টির রাখালেরা, এবং উত্তেমালাই, হোগেনাইকাল এবং কাবেরীর তীরে বসবাসরত জেলেরা হলফ করে বলল যে, বছরের এই সময় এ এলাকায় কোনও ধরনের মাংসাশী প্রাণী থাকার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। বছরের এ সময়টা এমনিতেই উষ্ণ, উপরন্তু এবার গরমটা একটু বেশিই পড়েছে। সম্বরেরা উঁচু পর্বতের দিকে সরে পড়েছে, অন্যদিকে চিত্রা হরিণেরা আশ্রয় নিয়েছে তুলনামূলক কম উষ্ণ অরণ্যে। স্বাভাবিকভাবেই এখানে বসবাসরত মাংসাশী প্রাণী আর তাদের শিকারের পিছু পিছু এ এলাকা ত্যাগ করেছে।

বাঘটা কোথা থেকে উদয় হলো তা কেউই বলতে পারল না। কেন যে তাদের হত্যা করল এবং তার পর না খেয়েই চলে গেল, তা-ও এক রহস্য।

পানপট্টির এই রহস্যময় হত্যাযজ্ঞ যখন ঘটে সেসময়ই বিখ্যাত শিকারী কেনেথ এন্ডারসন নিজ জমি পরিদর্শনে আনচেট্টি এসেছিলেন। ছোট্ট এই গ্রামটির অবস্থান দুর্ঘটনাস্থল থেকে মাত্র বিশ মাইল দূরত্বে একই জঙ্গলের ভিতর। যদিও তখনও সেখানে দুর্ঘটনার সংবাদটি পৌছায়নি। পরবর্তীতে এন্ডারসন আনচেট্টি ত্যাগ করে পায়ে হেঁটে গুন্দালাম নামের অন্য একটি পল্লিতে আসেন। এখান থেকে ঢালু পথ ধরে ষোলো মাইল নীচের একটা ঝরনার কাছে চলে আসেন তিনি। এক পর্যায়ে কাবেরীতে আত্মহনন দেয়ার কারণে এ ঝরনাটাকে তিনি ডাকেন 'গুপ্তনদী' বলে। 'গুপ্তনদী' পার হয়ে আরও মাইল দশেক রাস্তা অতিক্রম করে উত্তেমালাই পৌছে এন্ডারসন দেখেন এখানকার জেলেরা পানপট্টিতে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা নিয়ে ভীষণ উত্তেজিত।

আসলেই বিষয়টা কী তদন্ত করে দেখার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। পর্বতের ভিতর দিয়ে চলে যাওয়া শর্টকাট রাস্তাটা তাকে অল্প সময়ের মধ্যেই পানপট্টির দুই ফার্লং নীচে চিনারের তীরে পৌছে দিল। এখানে এসে এন্ডারসন দেখলেন বেশ কয়েকজন বাখাল আর পূজারী একটা গাছের নীচে জটলা পাকিয়ে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছে। বাঘটা আক্রমণ করতে পারে এই আশঙ্কায় গত দুই দিন ধরে তারা গবাদিপশু নিয়ে জঙ্গলে যাচ্ছে না। অবশ্য প্রাণীটা সত্যি সত্যি তাদের আক্রমণ করবে, এ কথা

কয়েকজন রাখাল ছাড়া আর কেউই বিশ্বাস করে না বেশিরভাগ রাখাল আর সব পূজারীই মনে করে তারা বা তাদের গবাদিপশুগুলো সম্পূর্ণ নিরাপদ হত্যাকারী বাঘটা মানুষখেকো নয়, কারণ এটা মহিলা কিংবা বাচ্চাটার কারও মাংসই খায়নি এটা গোখেকোও নয়, তা হলে পট্টির শত শত পশুর মধ্যে কোনও না কোনওটা আক্রান্ত হত। এটা সাধারণ কোনও বাঘও নয়, কারণ সম্প্রতিক সময়ে জঙ্গলের মধ্যে কোনও সম্বর কিংবা চিতলের লাশ তাদের কারুরই নজরে পড়েনি। গত কিছুদিনের মধ্যে শকুনের দলকেও আকাশে চক্কর দিতে কিংবা মৃতদেহ নিয়ে মারামারি করতে দেখা যায়নি।

আসলে এটা বাঘ কিংবা চিতাবাঘ কোনওটাই নয়– অন্তত রক্তমাংসের কোনও প্রাণী নয়। এটা পূজারী কাইয়ারার আত্মা, যে কন্যা আর নিজের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিয়েছে দাম্ভিক সত্যনারায়ণকে সে যে অভিশাপ দিয়েছে তা বাস্তবায়িত করার জন্যই বাঘের রূপ নিয়ে সে আবার ফিরে এসেছে

কাইয়ারার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পট্টির সবচেয়ে বয়স্ক পূজারীটি এক ফাঁকে নিচু স্বরে এন্ডারসনকে জানাল, এটাই শেষ নয়, এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যমে কেবল অভিশাপের অর্ধেক সম্পন্ন হলো। মূল দুই অপরাধী হত্যাকারী সত্যনারায়ণ ও তার বদ ড্রাইভার এখনও সুস্থ দেহেই ঘুরে বেড়াচ্ছে

পূজারী লোকটাকে এভাবে নিজের মনের কথা প্রকাশ করে দিতে দেখে এন্ডারসন রীতিমত বিস্মিত হলেন। ভারতীয়রা গুরুত্বপূর্ণ কোনও গোপন তথ্য ভিন্ন বর্ণ ও সম্প্রদায়ের কোনও লোকের কাছে প্রকাশ করতে চায় না তাদের অনেকেই মনে করে পশ্চিমারা বোকা, কোলাহল প্রিয় এবং তাদের কোনও অবস্থাতেই বিশ্বাস করা যায় না। বিশেষ করে গ্রাম ও অরণ্য জনপদে বসবাসকারী লোকদের মধ্যে এই ধারণা অত্যন্ত পাকাপোক্তভাবে আসন গেড়ে আছে প্রথমে এন্ডারসনকে কিছু তথ্য দিয়ে ফেললেও এই বয়স্ক পূজারীও পুরোপুরি-ভাবে এই সংস্কারের বাইরে নয় আর তাই ছলে-বলে-কৌশলে একেবারে প্রথম থেকে শুরু করে সেদিনের সেই ঘটনা পর্যন্ত পুরো কাহিনিটা তার পেট থেকে বের করে আনতে এন্ডারসনকে প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে তাকে জেরা করতে হলো। এখানে জানিয়ে রাখা ভাল, এতক্ষণ ধরে পাঠককে যে গল্পটা শোনানো হয়েছে তা তার এই জেরারই ফল। অবশ্য কাহিনিকে আরও শক্তিশালী ও সহজবোধ্য করার জন্য এন্ডারসন এর সাথে জঙ্গলের প্রচলিত কিছু বিশ্বাস এবং পট্টির অন্যদের কাছ থেকে সংগৃহীত কিছু তথ্যও যোগ করেছেন।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া পুরো কাহিনিটি উদ্ধার করতে পেরে এন্ডারসন নিজেকে রীতিমত সৌভাগ্যবান মনে করলেন এবং পুরো কাহিনিটিই তিনি বিশ্বাস করলেন না। নিঃসন্দেহে জঙ্গলের অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত নানা কুসংস্কার কাহিনিটির ডাল-পালা বিস্তারে সাহায্য করেছে। তাঁর নিজের ধারণা হত্যাকারী প্রাণীটা সাধারণ একটা বাঘ ছাড়া আর কিছু নয়। হয়তোবা প্রাণীটা কোনওভাবে আহত হয়েছিল। মা ও বাচ্চাটাকে দেখামাত্র ব্যথায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য প্রাণীটা ক্রোধে উন্মাদ হয়ে তাদের উপর হামলা চালায়। সম্ভবত ছোট বাচ্চাটার কান্না বাঘটাকে প্রলুব্ধ করতে পারে, কিংবা বলা যায় না– বাচ্চাটার কান্না এটাকে রাগিয়েও দিতে পারে। বাঘটার আক্রমণের পিছনে এ ধরনের আরও অসংখ্য কারণ থাকতে পারে কিন্তু এটা

যে একটা রক্তমাংসের প্রাণী, এ বিষয়ে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। একই ভাবে বাঘটা তার শিকারের মাংস না খাবার পিছনেও অসংখ্য যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে।

দেরি না করে তিনি বাঘটাকে মারার তোড়জোর শুরু করে দিলেন। এসময় এন্ডারসন কোনও কাজ করছিলেন না, ফলে তাঁর হাতে সময়ের কোনও অভাব ছিল না।

এন্ডারসন তাঁর আগের শিকার কাহিনিগুলোতেও উল্লেখ করেছেন প্রত্যেকটি মানুষখেকো বাঘ কিংবা চিতাবাঘ তার নিজস্ব সীমায় একটা নিয়ম মেনে চলাচল করে। অর্থাৎ এক জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলে যাতায়াতের সময়, কোনও গ্রামের পাশ দিয়ে যাবার সময়, নদীর তীরে বা ঝরনা অতিক্রমের সময় কিংবা জঙ্গলের ট্রেইল ব্যবহারের সময় এটা একটা নির্দিষ্ট ভ্রমণ পথ অনুসরণ করে। কোনও একটা পথে ভ্রমণের সময়, এবং এসময় একজন বা দু'জন মানুষকে হত্যা করার নির্দিষ্ট সময় পর, সে আবার সেই একই ট্র্যাক অনুসরণ করে। এভাবে একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর সে ঘুরে-ফিরে বিশেষ বিশেষ কিছু রাস্তা ধরেই চলাফেরা করে। কাজেই ধৈর্য ও সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে মানুষখেকো চলাচলের বিশেষ এই নিয়মটা ধরে ফেলা তেমন কঠিন কোনও বিষয় নয়। আর সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট স্থানে টোপ দিয়ে ওটাকে প্রলুব্ধ করা কিংবা আগে থেকেই ওটার জন্য লুকিয়ে অপেক্ষা করা সম্ভব।

কিন্তু এবারের এই বিশেষ বাঘটির ক্ষেত্রে মানুষখেকো শিকারের এই সাধারণ পদ্ধতি অনুসরণ একেবারেই অসম্ভব, কারণ এই প্রাণীটি আশপাশে বেশ কয়েক মাইলের মধ্যে আর কোনও মানুষকে হত্যা করেনি। আর এন্ডারসন তো আগেই উল্লেখ করেছেন কোনও গবাদিপশু এটার দ্বারা আক্রান্ত হয়নি। এমনকী ইদানীং এটা কোনও হরিণ কিংবা শুয়োর মেরে খেয়েছে এমন তথ্যও পাওয়া যায়নি।

এন্ডারসন বাঘটার পায়ের ছাপ কিংবা এটার রেখে যাওয়া অন্য কোনও চিহ্ন যা এটা পুরুষ না স্ত্রী সনাক্তকরণে সাহায্য করবে, খুঁজে পাবার আশায় চিনারের তীর, নদীর দুই পাশের ঢাল, নিচু জমি ও আশপাশের বেশ কয়েক মাইল এলাকা চষে বেড়ালেন। এ কাজে তাঁকে সাহায্য করল পট্টির রাখাল ও পূজারীরা, কিন্তু এটার কোনও পায়ের ছাপই তাঁরা খুঁজে পেলেন না। তবে বিশেষ এই বাঘটি নিঃসন্দেহে পুব দিক থেকে এসেছে। তুলনামূলক ভাবে হালকা গাছপালা ও গুল্ম জাতীয় ঝোপঝাড়ের এই জঙ্গলটা ইতিমধ্যে চাষাবাদের কারণে প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। কোনও বাঘের বসবাসের জন্যই জায়গাটা আর উপযোগী নয়। আর তাই বাধ্য হয়ে এটা পানপট্টির জঙ্গলে চলে এসেছে।

এন্ডারসন সত্যনারায়ণের বাবার পাল থেকে তাকে চারটি গরু ধার দিতে রাখালদের রাজী করিয়ে ফেললেন। তিনি কথা দিলেন গরুগুলো মারা গেলে তিনি তার ক্ষতিপূরণ দেবেন। তিনি নিশ্চিত এই পরিস্থিতিতে গরুর মালিক ভদ্রলোক তাঁর এই গরু ধার করার বিষয়টিতে কোনও আপত্তি করবেন না, তারপরও বিষয়টা তাঁকে অবহিত করার জন্য একজন রাখালকে ধর্মপুরী পাঠিয়ে দিলেন।

এন্ডারসন কিছুটা বিস্মিত হয়ে লক্ষ করলেন পট্টির পূজারীরা বাঘ শিকারে তাঁকে সাহায্য করতে মোটেই আগ্রহী নয়। পট্টির একজন বয়োজ্যেষ্ঠ পূজারী তাঁকে জানাল,

তারা কোনও ভাবেই প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বাঘের রূপ নিয়ে ফিরে আসা তাদের প্রাক্তন সঙ্গীর জন্য ফাঁদ পাতার কাজে এন্ডারসনকে সাহায্য করবে না। তা ছাড়া, তিনি কী করে ভাবলেন সে তার ফাঁদে পা দেবার মত বোকামি করবে, কিংবা তার শরীরে এন্ডারসনকে গুলি লাগাতে দেবে! উল্লেখ্য অরণ্যের অধিবাসীদের প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী সীসায় তৈরি সাধারণ বুলেটের সাহায্যে আত্মাদের কোনও ক্ষতিই করা সম্ভব নয়। নিশ্চিতভাবেই তাঁকে পূজারীরা সাহায্য না করার এটাই কারণ।

তবে পূজারীরা তাঁকে সাহায্য করতে রাজি না হলেও টাকার লোভ দেখিয়ে তিনি রাখালদের ঠিকই তাঁর দলে ভিড়িয়ে ফেললেন। প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং ঢাল ও নীচের এলাকা বার বার ঘুরে-ফিরে পর্যবেক্ষণ করে তিনি বাঘ চলাচল করতে পারে এমন সম্ভাব্য চারটি জায়গা নির্বাচন করলেন। তারপর নির্দিষ্ট জায়গাগুলোতে টোপগুলোকে বেঁধে ফেলা হলো। এখন শুধু কখন একটা টোপ বাঘের হাতে মারা পড়ে তার জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা।

তবে এই সময়টা বেকার বসে না থেকে তিনি বাঘের পায়ের ছাপের খোঁজে চিনারের দুই তীরে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এ কাজে তাঁকে সাহায্য করার জন্য তিনি তাঁর পুরান বন্ধু বাইরা ও রাঙ্গাকে এখানে আসার জন্য খবর পাঠালেন: বাইরা, যে নিজেও একজন পূজারী, এখান থেকে মাইল পনেরো দূরের অন্য একটা পল্লী আন্নাবিদ্যাহিল্লাতে বসবাস করে। আর রাঙ্গার সাথে সম্ভবত শিকার কাহিনি প্রিয় পাঠকদের নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কিছু নেই, পূর্বের অনেক মানুষখেকো শিকার অভিযানেই সে এন্ডারসনের সঙ্গী হয়েছে। তারা দু'জনেই খুব ভাল ট্র্যাকার এবং পানপট্টি আর এর আশপাশের পুরো এলাকাটা তারা বেশ ভালভাবেই চেনে। কিন্তু তাদের তিনজনের অক্লান্ত পরিশ্রম কোনও কাজে আসল না। ব্যর্থতায় রূপ নিল, তাঁরা বাঘের একটা পায়ের ছাপও খুঁজে পেতে ব্যর্থ হলেন। যেমন অপ্রত্যাশিত ভাবে ও নীরবে এটা আবির্ভূত হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে যেন এটা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

দেখতে দেখতে এন্ডারসনের বাঙ্গালোর ফিরবার সময় হয়ে গেল। এই সময়ে একটা টোপও বাঘের হাতে মারা পড়েনি, অগত্যা কিছু সম্মানী সহ তিনি এগুলোকে রাখালদের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। সাধারণ অবস্থায় এ ধরনের বিনিময় একেবারেই অস্বাভাবিক। শিকারীদের পুরো মূল্য পরিশোধ করেই টোপের জন্য পশু কিনতে হয়।

এক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটার কারণ তারা পুরোপুরি নিশ্চিত ছিল টোপ হিসাবে ব্যবহৃত একটা পশুও বাঘের হাতে মারা পড়বে না। কীভাবে পড়বে, যেখানে সত্যিকারের কোনও বাঘই এ মুহূর্তে বনে নেই।

এন্ডারসন ব্যর্থ হয়ে বাঙ্গালোর ফিরে যাওয়ার দুই মাস পরের ঘটনা। সত্যনারায়ণের বাবাকে পঁয়ষট্টি মাইল দূরের জেলা শহর সালেমে পৌঁছে দিয়ে ড্রাইভার দাস একা গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরছে। রাতের আগেই ধর্মপুরি পৌঁছানোর জন্য কিছুটা দ্রুত গতিতেই সে গাড়ি চালাচ্ছে। ধর্মপুরি পৌঁছাতে তাকে আরও চল্লিশ মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে। এখানে এসে রাস্তাটা হঠাৎ করেই সরু হয়ে নীচের বড় দীঘিটার উপর তৈরি করা কুণ্ডলী পাকানো বাঁধটার উপর দিয়ে চলে গেছে। আশপাশে অন্য কোনও যানবাহন না থাকায় দাস গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল।

তখনই গাড়ির স্টিয়ারিং হুইলে কিছু একটা ঘটেছে কিংবা হয়তো তার গাড়ির

সামনের কোনও একটা চাকা ফেটে যায়। কেউই নিশ্চিত ভাবে বলতে পারে না আসলে কী হয়েছিল। পুরো ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করা দুজন পথচারীর কাছ থেকে শুধু এটুকু জানা যায়, রাস্তাটা যেখানে বাম দিকে বাঁক নেয় সেখানে এসে হঠাৎই রাস্তা ছেড়ে বাঁধের পাশে ইঁটের বেষ্টনীর দিকে ছুটে যায় গাড়িটা। তারপরই এটা বেষ্টনীর পাতলা ইঁটের দেয়াল ভেঙে নীচের দীঘিতে পড়ে যায়। গাড়ির জানালাগুলো লাগানো থাকায় দাস ভিতরেই আটকা পড়ে। এক সপ্তাহ পরে স্থানীয় জনসাধারণ গাড়ি আর তার মৃতদেহ উদ্ধার করে।

বেশ কিছুদিন আগে যে দীঘিতে সে আর তার মালিক-পুত্র সত্যনারায়ণ পূজারীর মৃতদেহ ফেলে দেয়, সেই দীঘিতেই ডুবে তার মৃত্যু হলো–এটা কি নিছকই কাকতালীয় ঘটনা, নাকি এর পিছনে অলৌকিক কোনও একটা শক্তি কাজ করেছে?

সত্যনারায়ণের কানে যখন ঘটনাটা পৌঁছাল তখন সে পাগলের মত আচরণ শুরু করল। প্রথমে তার একমাত্র ছেলে, তারপর স্ত্রী এবং এখন গাড়ি চালক দাস।

সে বৃদ্ধ পূজারী আর তার মেয়ের হত্যাকাণ্ডের কথা স্মরণ করল। এ-কান ও-কান করে তার আর তার পরিবারের উপর দেয়া পূজারীর অভিশাপের কথাও শুনল সে। সত্যনারায়ণ বিশ্বাস করতে শুরু করল এবার তার পালা। সে উপলব্ধি করল তাকে অবশ্যই মরতে হবে। এদিকে হাসপাতাল থেকে ফিরে গোপালস্বামী আবিষ্কার করলেন তাঁর ছেলে পুরোপুরি উন্মাদ হয়ে গেছে। দেরি না করে তিনি তাকে সালেমে নিয়ে আসলেন, এবং এখানকার চিকিৎসকদের শরণাপন্ন হলেন। কিন্তু সালেমের সেরা সেরা ডাক্তাররা সত্যনারায়ণের জন্য কিছুই করতে পারলেন না, সে শুধু ক্রমাগত ক্ষিপ্তের মত কাইয়ারা ও মারদি এ নাম দুটোই আউড়ে যাচ্ছে।

সত্যনারায়ণকে এবার মাদ্রাজে নিয়ে আসা হলো এবং এখানকার একটি মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়া হলো। হাসপাতালের চিকিৎসকরা আবিষ্কার করলেন সত্যনারায়ণ বিড়বিড় করে যে দু'জন মানুষের নাম আউড়ে যাচ্ছে তার এই ক্ষিপ্ত আচরণের পিছনে তাদের কোনও না কোনও ভূমিকা আছে। কিন্তু চিকিৎসায় কাজ হলো না। তার বাবা নিশ্চিত হলেন, সত্যনারায়ণ পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছে। তাকে বাড়িতে নিয়ে আসা হলো। সারাক্ষণ তার দেখাশোনা করার জন্য দু'জন লোক নিয়োগ দেয়া হলো। গোপালস্বামী আশা করলেন আস্তে আস্তে তার অবস্থার উন্নতি হবে।

কিন্তু তাঁর জন্য শুধু হতাশাই অপেক্ষা করছিল। ছেলের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগল। সে এখন রীতিমত হিংস্র হয়ে উঠেছে। ছেলেকে স্থায়ীভাবে মাদ্রাজের একটি পাগলাগারদে ভর্তি করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। কারণ পূজারী কাইয়ারার অভিশাপের শেষ অংশ যে এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। অন্তত স্থানীয় অধিবাসীরা তাই বিশ্বাস করে।

একদিন সকালে সত্যনারায়ণের দেখাশোনা করে যে লোকটা, নাস্তা নিয়ে এসে দেখল, কামরায় নেই সে। পুরো শহর তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান করেও তার কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না। এমনকী কেউ তাকে দেখেছে এমনটিও মনে করতে পারল না।

সত্যনারায়ণ নিখোঁজ হওয়ার ঠিক চারদিন পর প্রধান সড়ক থেকে পানপট্টির গরু-বাছুর চরানোর জায়গাটার দিকে চলে যাওয়া রাস্তাটার উপর আকাশে শকুনের

দলকে উড়তে দেখা গেল। বেশ বড় একটা এলাকা নিয়ে এরা জায়গাটা চক্কর দিচ্ছে। এদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। তারপরই বাতাসে পাখার ঝটপট শব্দ তুলে একটার পর একটা শকুন মাটিতে নেমে আসতে লাগল।

এ বছরই পট্টির গরু-বাছুর চরানোর চাকরি নেওয়া বাইরা শকুনের দলকে উড়তে দেখে ও এদের শব্দ শোনে। এ সময় সে গরু-মোষের একটা দলকে জঙ্গলের দিকে চরাতে নিয়ে যাচ্ছিল। সে জানে শকুনের দল একটা মড়ি আবিষ্কার করেছে। বাইরা বিষয়টি তদন্ত করে দেখার সিদ্ধান্ত নেয়। বলা যায় না এখান থেকে নিজের জন্য কিছু মাংস সে পেয়েও যেতে পারে।

বেশ সহজেই মড়ি খুঁজে পাওয়া গেল। শকুনগুলো প্রচণ্ড হৈ চৈ ও নিজেদের মধ্যে মারামারি করার শব্দ তাকে ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে সাহায্য করে। বাইরা দেখল পাখিগুলো মৃতদেহটার চারপাশ ঘিরে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে আছে, তবে এরা এখনও খাওয়া শুরু করেনি। যেন খাওয়া শুরু করতে ভয় পাচ্ছে।

তাদের আতঙ্কের কারণ, তারা যে জিনিসটা খাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটা একটা মানুষের মৃতদেহ। মৃতদেহটা সত্যনারায়ণের এবং সে একটা বাঘের হাতে মারা পড়েছে। তবে তার শরীরের একটু মাংসও খায়নি বাঘটা।

পরবর্তীতে যখন এন্ডারসনের সাথে বাইরার দেখা হয়, সে তাকে জানাল, অন্য পূজারী আর রাখালেরা আশপাশের এলাকায় চিরুনি অভিযান চালিয়েও বাঘটির পায়ের ছাপ খুঁজে পায়নি। তারপর সে শ্রাগ করল– কীভাবে পাবে? লম্পটটাকে আসলে কোনও বাঘে মারেনি। মোদ্দা কথা, কাইয়ারা তার কাজটা বেশ ভাল ভাবেই শেষ করেছে।

***

কেনেথ এন্ডারসন-এর

জঙ্গলে অমঙ্গল

রূপান্তরঃ ইশতিয়াক হাসান ফারুক

এটি বিশ্ববিখ্যাত শিকারি কেনেথ এন্ডারসনের চারটি রোমাঞ্চকর কাহিনির সঙ্কলন।
এতে রয়েছেঃ দিগুভামুট্টার গুপ্তঘাতক, অরণ্যের দিনরাত্রি, বেলান্দারের বিভীষিকা ও জঙ্গলে অমঙ্গল।
পাঠক, অরণ্যচারী এন্ডারসনের অনবদ্য অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলো আপনাকে নিঃসন্দেহে মুগ্ধ ও শিহরিত করবে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
প্রজাপতি শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০